অনীক

জুন ২০১১
বর্ষ ৪৭ q সংখ্যা ১২

সম্পাদকীয় q ১

ঘটনাপ্রবাহ
মানবাধিকার আন্দোলন ও সরকার... q দীপ্র চৌধুরী q ২
এম এফ হোসেন এবং তসলিমা... q দামিনী চৌধুরী q ৩
জমি ফেরতের বিতর্ক q প্রণব দে q ৫

খোলা চিঠি
হ্যালো নিরুপমবাবু... q দীপংকর চক্রবর্তী q ৪

প্রবন্ধ
সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই
q সঞ্জীব আচার্য্য q ৮

নির্বাচন ও তারপর
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট কী ভুল করেছে q অশোক মিত্র q ১৫
প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের... q অরিন্দম সেন q ১৭
বামফ্রন্ট পরাজিত:বামপন্থার ভবিষ্যৎ... q পার্থসারথি q ২০
শুরু হোক প্রকৃত বামপন্থার পুনরুজ্জীবন q সুকান্ত রায় q ২৭
বামপন্থীদের বিপর্যয়ের কারণ q রতন খাসনবিস q ৩০
বিধানসভা নির্বাচনের হালহকিকৎ
q দেবাশিস ভট্টাচার্য q ৩৩

স্মরণ
বাদল সরকার ... q অরূপ মুখোপাধ্যায় q ৩৯

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও
টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৯
দূরভাষ
সম্পাদক : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০।
গ্রাহক-সম্পর্কিত : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২ / ৯৮৩০৪৩৩৬৫
ই-মেল : aneek64@gmail.com

কার্যালয়
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা - ৭০০ ০০৯
(মঙ্গল/শুক্র : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদক : **দীপংকর চক্রবর্তী। রতন খাসনবিশ**

বামপন্থার সংকট?

পশ্চিমবঙ্গে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভরাডুবি এবং তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের ক্ষমতা দখল কি বামপন্থার সংকট ডেকে আনতে চলেছে? এ প্রশ্নটিই এই মুহূর্তে বামপন্থীদের বিশেষভাবে তাড়িত করছে।

এই দাবি মেনে নিতে হলে তার কিন্তু একটা পূর্ব-শর্ত ধরে নিতে হয়, এবং সেটা হচ্ছে এই যে, এতদিন বামপন্থার কোনো সংকট ছিল না। আর সেটাতেই আমাদের আপত্তি। কেননা দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের দেশে বামপন্থা গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়ে আছে। বিগত শতকের ষাটের দশকে মতাদর্শগত লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন কতটা মতাদর্শগত কারণে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তার পরে নকশালবাড়ি আন্দোলন একটি বিপ্লবী প্রবণতার জন্ম দিলেও, শেষ পর্যন্ত 'বাম' বিচ্যুতির ফলে তা ব্যর্থতা ও হতাশা ডেকে আনে। যাঁরা শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত জনবিচ্ছিন্নতার স্বরূপ উপলব্ধি করে বিকল্প পথে এগোতে চেষ্টা করেন, তাঁরাও আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট রণনীতি ও রণকৌশলবিশিষ্ট কর্মসূচি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরিণতিতে মূলত গণসংগ্রাম-বর্জিত ব্যক্তিহত্যা-ভিত্তিক সশস্ত্র লড়াইয়ের মৌলিকভাবে ভ্রান্ত লাইন আবার প্রকৃত বিপ্লবাকাঙ্ক্ষীদের পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যদিকে সিপিআই(এম)-এর সংসদ-সর্বস্ব লাইন 'বামপন্থা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়, এবং ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা পশ্চিমবঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-অনুপ্রাণিত নিও-লিব্যারাল অর্থনীতির পথে বিশ্বায়নের অঙ্গ হিসেবে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে 'উন্নয়ন'-এর বিশ্বস্ত সারথিতে রূপান্তরিত হয়। তাই তাদের বিদায় আর বামপন্থার সংকটকে অভিন্ন করে দেখার কোনো কারণ নেই। ফলত, সব মিলিয়ে বামপন্থার সংকট ছিলই, এবং এখনও তা রয়ে গেছে একটি নির্মম বাস্তবতা হিসেবে।

এই সংকটেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে প্রকৃত বিপ্লবীদের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষক সংগ্রাম ও তার প্রভাবে সাম্প্রতিক গণবিস্ফোরণকে ব্যবহার করে 'বামপন্থী' স্লোগান তুলে মমতা-র নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের অভাবনীয় উত্থানের মধ্যে। নিশ্চিতভাবেই এই নতুন জমানায় দক্ষিণপন্থা স্বরূপে ও স্বমূর্তিতে অচিরেই আত্ম-প্রকাশ করবে। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রকৃত বিপ্লবাকাঙ্ক্ষীরা আর এর একবার সুযোগ পাবেন সুনির্দিষ্ট রণনীতি ও রণকৌশলবিশিষ্ট কর্মসূচি গড়ে তোলার। কী গভীর সংকট আসছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হবার বদলে নতুন পরিস্থিতিতে তার ভিত্তিতে বিপ্লবের কাজকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়,সেজন্য জরুরি প্রচেষ্টা শুরু করাটাই কি বিপ্লবকে আরও ত্বরান্বিত করবে না?

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

মানবাধিকার আন্দোলন ও সরকার-নির্ভরতা

ভারত-সহ সমস্ত দেশের মানবাধিকার আন্দোলনের একটি মৌলিক ভিত্তিভূমি হচ্ছে সরকার-নিরপেক্ষতা। কেননা এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে জনমত ও সাধ্যমতো লড়াই গড়ে তোলা, সরকার হচ্ছে তারই বশংবদ চালক। সে কারণেই এই আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ ও কর্মসূচি অবশ্যই গড়ে তোলা দরকার এমনভাবে, যাতে সরকারের বা সরকারি দলের স্বার্থ নয়, বরং মানবাধিকারই সব সময়ে সার্বিক ও সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে সরকারের কোনো পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাতে যেমন দ্বিধা রাখার যুক্তি নেই, ঠিক তেমনি সরকারের কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপকে সমালোচনা করার বা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাকে নিন্দা করার ও তার বিরুদ্ধে সাধ্যমতো জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নেও কোনোরকম আপসকে প্রশ্রয় দেওয়াটা হবে খুবই গুরুতর বিচ্যুতি।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত শতকের সত্তরের প্রথমে যখন সংগঠিত মানবাধিকার আন্দোলনের অনুশীলন শুরু হয়েছিল, তখন সরকার ও আন্দোলনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত অনুসৃত হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেসি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে অনেক সময়েই এই আন্দোলন ও সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি লড়াইয়ের একই দিকে থেকেছে। তাই বলে নির্বাচনের সময় মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা বিরোধীদের সাংগঠনিকভাবে সার্বিক সমর্থন জানান নি, কিংবা ১৯৭৭-এ বিরোধীরা, অর্থাৎ বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতাসীন হলো, রাতারাতি তাদের পক্ষভুক্ত হয়ে যান নি। আন্দোলনের চাপে সেই সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্তকে যেমন তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন, ঠিক তেমনি সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও গড়িমসির বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রতিবাদ জানাতেও দ্বিধা করেন নি। আবার সেই সরকারই যখন পরবর্তীকালে স্বৈরতন্ত্রের প্রবণতা দেখাতে এবং মানুষের অধিকারের উপর আক্রমণ শুরু করলো— সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম লড়াইয়ের কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মের বা রাজ্যের ব্যাপক নাগরিক সমাজ পথে নামার অনেক আগে— তখনই তাঁরা সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো লড়াই শুরু করেছেন।

যার ধারাবাহিকতায় গত প্রায় পাঁচ বছরের সারা রাজ্য-জোড়া গণজাগরণের প্রেক্ষিতে সব সময়েই সামনের সারিতে থেকেছেন মানবাধিকার কর্মীরা। নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরকার-বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে প্রচারে অংশ নিলেও, সামগ্রিকভাবে মানবাধিকার কর্মীরা মূলত দল-নিরপেক্ষই থেকেছেন। কিন্তু ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হতেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের পক্ষে চলে গেছেন (ঠিক যেমন আগের জমানাতেও বামপন্থার চরম বিরোধী বেশ কিছু লোক প্রায় রাতারাতি 'বাম'-সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন)। ফলত এই রাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। একেই মানবাধিকার আন্দোলনের দাবি অনুসারে ১৯৭৭-এর বামফ্রন্ট সরকারের মতো নতুন সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে নি। যে সরকারকে (সঠিকভাবেই) স্বৈরতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করে তাদের সর্বাত্মক বিরোধিতার ফলে আজকের শাসক দলের ক্ষমতায় বসার সুযোগ মিললো, তাদের গৃহীত প্রথম সঠিক ও ইতিবাচক পদক্ষেপটি নতুন সরকার তো নেয়ই না, তার উপর প্রতিটি বন্দীর মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমলা-সংখ্যাগরিষ্ঠবিশিষ্ট একটি কমিটির উপর। আর মুক্তির প্রশ্নেও যে সব বিষয়কে বিবেচনা করা হবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলিও এক কথায় অযৌক্তিক ও অপমানজনক। গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে কমিটি দেখবে— বন্দীরা সংশোধনাগারে কীভাবে কাটিয়েছেন? অর্থাৎ স্পষ্টতই এক্ষেত্রে নির্ভর করতে হবে স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশ্বস্ত আমলাদের রিপোর্টের উপর। এখানেই শেষ নয়, বিবেচনা করে দেখা হবে— বন্দীরা মুক্তি পেলে কীভাবে থাকবেন এবং আবার 'অশান্তি' পাকিয়ে তুলবেন কিনা। অর্থাৎ কার্যত 'মুচলেকা' দিতে হবে। গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজ এই অপমানজনক শর্ত দেখেও নীরব থাকবে? ট্র্যাজেডি হচ্ছে এটাই যে, অধিকাংশ মানবাধিকার কর্মী তাঁদের ঐতিহ্যগত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবির অবস্থানে, এবং সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনায় অবিচল থাকলেও, কেউ কেউ (এমনকি মূলত বন্দীমুক্তির দাবিতে তৈরি একটি মানবাধিকার সংস্থার নেতৃস্থানীয় এবং 'বামপন্থী' হিসেবে পরিচিত অনেকেও, মাত্র একমাস আগেও যাঁরা সমস্ত বন্দী মুক্তিতে গলা ফাটিয়েছেন) বন্দীমুক্তির দাবিতে জনমত তৈরি করার কর্মসূচি নেওয়া দূরের কথা, এই সরকারের প্রতি সমালোচনামূলক কোনো অবস্থান নিতেই অস্বীকার করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা অতীত ইতিহাস বিকৃত করছেন, আন্দোলন-কামীদের কুৎসা করছেন এবং আন্দোলনের ন্যূনতম যেটুকু কর্মসূচি এখনও পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে, সেগুলি যাতে ব্যর্থ হয়, সেজন্য পরিচয় গোপন করে প্রচার চালাচ্ছেন। জনে জনে বারণ

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

করে বার্তা পাঠাচ্ছেন, তাতে যাতে কেউ যোগ না দেয়। এ প্রসঙ্গে তিনটি পূর্ব-দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। ১৯৩১-এর গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত, এমন সব বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা না হওয়ার ফলে সারা দেশে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, এবং শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে ১৯৩৭-এ ঔপনিবেশিক ভারতে নির্বাচিত বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। 'কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনের সুবিধে হয়ে যাবে'— এই অজুহাতে ১৯৭৭-এ ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতা সরকার গঠিত হবার কয়েক মাসের মধ্যে কানপুরে স্বদেশি মিলে পুলিশের গুলিতে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হলেও পিইউসিএল-এর সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত, কিংবা ১৯৭৯-এ পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপিতে পুলিশ নারকীয় গণহত্যা সংঘটিত করলেও পিইউসিএল-এর সভাপতি তারকুন্ডে সে সবের বিরোধিতা ও নিন্দা করতে অস্বীকার করেন। তা নিয়ে দেশ জুড়ে মানবাধিকার কর্মীরা বিতর্ক শুরু করেন, এবং অবশেষে এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সরকার-নির্ভর বা দল-নির্ভর মানবাধিকার আন্দোলনের ধারণা মানবাধিকারের মৌলিক মতাদর্শের বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার আন্দোলনেও এতোদিন এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হয়ে এসেছে।

এই প্রশ্নে এই রাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলন এই মুহূর্তে দ্বিধাবিভক্ত হলেও, আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা, মতাদর্শগত বিচ্যুতিকে কাটিয়ে উঠে মানবাধিকার আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী সরকার-নিরপেক্ষ অবস্থানের পতাকাই শেষ পর্যন্ত উত্তোলিত থাকবে।

দীপ্র চৌধুরী

এম এফ হুসেন এবং তসলিমা : আমাদের কলঙ্ক কি ঘচবে না ?

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী এম এফ হুসেন মারা গেলেন। ঘটনাটি শোকের নিঃসন্দেহ, কিন্তু আমাদের কাছে ঘটনাটি কলঙ্কেরও। আমরা ভারতের মানুষেরা এতই 'গণতান্ত্রিক' ও 'ধর্ম-নিরপেক্ষ', এবং আমাদের দেশের সরকার এতই সর্বশক্তিমান যে, আমরা তাঁকে নিরাপত্তা দিতে পারি নি, হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের অত্যাচারে শিল্পী বাধ্য হয়েছিলেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে। ফলত তিনি মারা গেলেন বিদেশের মাটিতে, দেশে ফেরার আকুতি বুকে গেঁথে নিয়ে।

আরেকটি ঘটনাও কিন্তু আমাদের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের গলায় কলঙ্কের কাঁটা হয়ে গেঁথে আছে, যা 'সেকুলার' হিসেবে আত্মপরিচয় দিতে সতত সক্রিয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কলঙ্কিত করে রেখেছে। মৌলবাদীদের সামনে মাথা নত করে বামফ্রন্ট সরকারের পরোক্ষ সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের কথা বলছি। তসলিমা আমাদের বাংলা ভাষারই একজন লেখক, তাঁর লেখার কিছু 'বিতর্কিত' অংশ বা মতামত সম্পর্কে সবার সমর্থন না-ও থাকতে পারে, তাঁরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা তুলতেই পারেন। আর বহু মতের মধ্যে বিতর্ক তো গণতন্ত্রেরই লক্ষণ। কিন্তু কোনো দেশের মৌলবাদীরাই গণতন্ত্রের খোলা হাওয়া পছন্দ করে না, বরং মতবিরোধ ঘটলেই বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে তৎপরতা দেখায়। সেই পথেই তসলিমার নিজের দেশের ইসলামি মৌলবাদীরা তাঁকে খুন করতে চেয়েছিল, এবং প্রাণরক্ষার তাগিদে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গকে স্বাভাবিকভাবেই ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভালোবাসার কারণে তিনি নিজের 'দ্বিতীয় স্বদেশ' বলে গ্রহণ করতে আকুলতা দেখিয়েছেন বারবার। কিন্তু এই বঙ্গের ইসলামি মৌলবাদীরাও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালিয়েছে, তাঁর প্রাণনাশের জন্য প্রকাশ্যে পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করেছে। 'প্রগতিশীল' ও 'পরম সেকুলার' বামফ্রন্ট সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় নি, বরং মৌলবাদীদের দাবিমতো তাঁর গ্রন্থকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা নিয়ে মামলা হয়েছে, রাজ্যের ও সারা দেশের সর্বোচ্চ আদালত সরকারি সেই নিষেধাজ্ঞাকে বাতিল করে দিয়েছে, এমনকি তার পর তসলিমা তাঁর লেখার 'বিতর্কিত' অংশটি পর্যন্ত নিজে থেকে বাদ দিয়েছেন। তবু পরম জিঘাংসায় মৌলবাদীরা তাঁকে এই রাজ্য থেকে তাড়াবার জন্য চক্রান্তের জাল বুনেছে, চাপ সৃষ্টি করার জন্য হাঙ্গামা বাধিয়েছে, এবং নরেন্দ্র মোদি-মার্কা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সতত সোচ্চার বামফ্রন্ট সরকার প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তসলিমাকে মনগড়া মিথ্যে অজুহাতে এ রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, সেই হাঙ্গামামূলক চক্রান্তের পিছনে ছিল প্রায় 'সর্বদলীয়'ভূমিকা ছিল— কংগ্রেস-তৃণমূল-সিপিআই(এম)— সমস্ত দলেরই কয়েকজন প্রভাবশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা এ ব্যাপারে বিশেষ সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে এখন জনগণের রায়ে বামফ্রন্ট সরকারকে বিদায় নিতে হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে নতুন সরকার— যার কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা। নতুন সরকার কি পারে না তসলিমাকে সসম্মানে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে এনে বাঙালিদের সেই কলঙ্ক মোচনের মাধ্যমে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানুষের প্রত্যাশা বাস্তবায়িত করতে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে কিন্তু নিজের দল ও সরকারের অ-সাম্প্রদায়িকতার তথা ধর্মের সাথে রাজনীতির সংমিশ্রণে অনীহার এবং মৌলবাদ-বিরোধিতার এবং সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অসাম্প্রদায়িকতার ঐতিহ্যের প্রমাণ রাখার এটাই সুযোগ।

দামিনী চৌধুরী

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

খোলা চিঠি

হ্যালো নিরুপমবাবু...

হ্যালো নিরুপমবাবু...!
হ্যাঁ মাননীয় প্রাক্তন রাজ্য-শিল্পমন্ত্রী, আপনাকেই বলছি। একটি নিরতিশয় জটিল ধাঁধাঁর সমাধান কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। তাই নিরুপায় হয়ে আপনার, এবং আপনার মাধ্যমে আপনাদের সদ্যপ্রয়াত বামফ্রন্ট সরকারের এবং তার প্রকৃত জনক আপনাদের সিপিআই(এম) পার্টির নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। আপনি কি একটু সময় দেবেন?

আমাকে আপনার মনে থাকার কথা নয়। কারণ জীবনে মাত্র একবার ঘন্টা দুয়েকের জন্য আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবং আজকে যে ধাঁধাঁর সমাধানের উদ্দেশ্যে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি সে বিষয়েই। বিষয়টি অবশ্যই খুবই পরিচিত আপনার, এবং আপনাদের দক্ষতায় সারা পৃথিবীর লোকেরই। বিষয়টি সিঙ্গুর!

সিঙ্গুর। পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্ট সরকারের একচেটিয়া-দেশি-বিদেশি-নির্বিশেষে বৃহৎ পুঁজিভিত্তিক উন্নয়নের জন্য (তথা 'পুঁজিবাদ বিকাশের') জন্য বিশ্বায়নের নয়া উদারবাদী পথে সংগ্রামের টেস্টিং গ্রাউন্ড, পরীক্ষাগার। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক জমি-অধিগ্রহণ আইনের বলে বলীয়ান আপনাদের রাজ্য সরকার সেখানে 'জনস্বার্থে' টাটার মোটরগাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য ৯৯৭ একর প্রধানত বহু-ফসলি জমি অধিগ্রহণ করেছিল ২০০৬ সালে। সেখানকার ছোটো ও প্রান্তিক কৃষকদের, এবং তৎসহ বিশেষত অ-নথিভুক্ত বর্গাদার ও খেতমজুরদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জমি ছাড়তে রাজি হন নি। তাই নিয়েই বেধেছিল সংঘাত। নাগরিক সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষকদের জীবিকা তথা জীবন বিপন্ন করে মূলত একটি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থকে 'জনস্বার্থ' বলে অভিহিত করে সিঙ্গুরে এভাবে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেছিল। এই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সেখানে দল-মত-নির্বিশেষে এক ব্যাপক আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়েছিল 'জমি বাঁচাও কমিটি'-র নেতৃত্বে। এই কমিটি ২০০৬-এর ২৭ সেপ্টেম্বর এপিডিআর প্রভৃতি অ-রাজনৈতিক কয়েকটি সংগঠনের সহযোগিতায় সিঙ্গুরে একটি গণশুনানির আয়োজন করা হয়। এর বিচারকমন্ডলীতে ছিলেন মেধা পাটকার, মহাশ্বেতা দেবী, মলয় সেনগুপ্ত এবং বর্তমান প্রতিবেদক।

সেই গণশুনানিতে প্রবল উৎসাহে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় অনেক মানুষ (যাদের মধ্যে ছিলেন ছোটো ও প্রান্তিক কৃষকেরা, বেশ কয়েকজন বর্গাদার ও খেতমজুর এবং কৃষক পরিবারের মহিলারা)। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও বিরোধিতা এবং এই বিরোধিতার জন্য তাঁদের উপর পুলিশি নির্যাতনের কাহিনী তাঁদের সাক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। শুনানির পর আমরা বিচারকবৃন্দ প্রাথমিকভাবে এই অভিমতে উপনীত হয়েছিলাম যে, (১) সিঙ্গুরের অধিকাংশ জমিই উর্বরা বহুফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে; (২) সিঙ্গুরের বহু মানুষ তাঁদের উর্বরা জমি দখল করে শিল্প গড়ার বিরোধী, এবং সচেতনভাবেই সরকার সিঙ্গুরের এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপর সিঙ্গুর প্রসঙ্গে সরকারি বক্তব্য জানার জন্য গণশুনানি কমিশন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, ৩০ অক্টোবর রাজ্য সরকারের পক্ষে শিল্পমন্ত্রী হিসেবে নিরুপমবাবু, আপনার সঙ্গেই আমাদের কমিশনের দু'ঘন্টা ধরে আলোচনা চলে। সেই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্যই প্রায় আপনারা দেননি। আপনি জানিয়েছিলেন, অধিগৃহীত ৯৯৭ একর জমির মধ্যে ৮৫১ একরের জন্য সম্মতিপত্র মিলেছে এবং ৪৬৮ একর বিক্রি হয়েছে। প্রাসঙ্গিক একটি তালিকাও আপনি দেখান, কিন্তু তার কপি চাওয়া সত্ত্বেও দেননি। স্বভাবতই শুধু আপনার মুখের কথায় সেই বক্তব্য মেনে নেবার কোনো যুক্তি আমরা পাই নি।

তাছাড়া কৃষিজমি শিল্পের জন্য কেন ব্যবহার করা হচ্ছে— এই প্রশ্নে আপনার উদ্ধত উত্তর ছিল : বহু-ফসলি জমি নিতেই হবে, না হলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন করা সম্ভব নয়। আসলে শিল্পায়ন বলতে আপনারা যা তখন বলছিলেন, সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-প্রণোদিত নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন কর্মসূচির প্রতিধ্বনি। আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিও আপনাদের সেই লাইনকে অনুমোদন করেছিল। আর নির্দিষ্টভাবে সিঙ্গুর প্রশ্নে তারপর বার বার আপনি, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতারা, গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডে আটকে যাওয়া পিনের মতো প্রকাশ্যে দাবি করেছেন যে, সেখানে সব জমিই মূলত অনুর্বর; সেখানে কেউ জমি দেবার বিরোধী নয়; গোটাটাই চক্রান্ত। বলেছেন, একবার অধিগৃহীত জমি আইনত কৃষকদের আর ফেরত দেওয়া যায় না। এবং গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে এই বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন যে, কারও ক্ষমতা নেই— সিঙ্গুরে টাটার কারখানা বন্ধ করতে পারে। তার পরবর্তীকালে ক্রমাগত পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হতেই, 'ভুল হয়ে গেছে' বলে কুমীর-নাকি কান্না কাঁদলেও, এই সেদিনও ভোটের আগে, বুদ্ধ ও গৌতমবাবুরা অষ্টম বামফ্রন্ট গড়ার সুযোগ পেলে টাটার কারখানা আবার করার ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা কী হলো? প্রথমত, আগেই হাইকোর্টে চলা মামলা থেকে প্রমাণ মিলেছিল যে, সিঙ্গুরের অধিকাংশ জমিই বহু-ফসলী উর্বর জমি এবং মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক জমি দিতে ইচ্ছুক নন। দ্বিতীয়ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বামপন্থী নন, মার্কসবাদী তো ননই, আমরা সবাই এতদিন যা

এর পর ২৯ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

জমি ফেরতের বিতর্ক

প্রণব দে

তাপসী মালিক যেদিন সিঙ্গুরে অত্যাচারিত হয়ে নিহত হয়েছিল, সেইদিনই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নিদান হাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তারপর রূপনারায়ণ-সুবর্ণরেখা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বামফ্রন্ট শাসনের অবসান হয়েছে, বিপুল সংখ্যাধিক্যে তৃণমূল জোট এই রাজ্যে এখন ক্ষমতাসীন। কিন্তু সিঙ্গুর তৃণমূল নেত্রীরও গলার কাঁটা। অধিগৃহীত জমি থেকে ৪০০ একর জমি মূল মালিকদের হাতে ফেরৎ না যাওয়া পর্যন্ত এই কণ্টক যন্ত্রণার অবসান নেই।

পশ্চিমবঙ্গের বিধান

অধিগৃহীত জমি ব্যবহৃত না হলে পূর্বতন মালিকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, এমন কোন দুর্লঙ্ঘ্য নিষেধাজ্ঞা আছে বলে মনে হয় না। জমি যদি নেওয়া যায়, তাহলে দেওয়াও যেতে পারে। তবে অবশ্যই বিধিসম্মত পদ্ধতিতে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ও সান্ত্রীরা গোঁ ধরে বসেছিলেন বটে, অধিগ্রহণের পর আর জমি ফেরত দেওয়ার অবকাশ নেই। তাই যদি হয়, তাহলে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯১ সালে নতুন 'ভূমি অধিগ্রহণ নির্দেশিকায়' (Land Acquisition Manual) এই পরিস্থিতির সংস্থান রেখেছিল কেন? উক্ত ম্যানুয়ালের দুটি ধারায় বলা হয়েছে-

> "147(2)- Although section 48(1) provides for the withdrawal of the Government from acquisition only when possession has not been taken, there is no objection to land being restored at any stage of the case after possession has been taken, when so desired by the authorities on whose behalf the acquisition has been made, provided that the persons interested in the land agree to this course and are willing to receive back their property with such compensation for damages and costs as may be awarded under section 48(2)."
>
> 166(2)- As regards surplus lands falling in clause (i) above i.e. land situated within agricultural or pastoral areas which are no longer required by any Government or public body or company, their disposal be guided by the following general instructions:-
>
> (a) All rights of land owners or occupiers which were extinguished by the acquisition of those lands should be first offered to the persons from whom they were acquired or to their heirs, if discoverable... etc"

দুটো ধারাতেই অধিগৃহীত জমি মূল মালিকদের ফেরত দেওয়ার নির্দেশ আছে। তফাৎ হচ্ছে, প্রথমোক্ত ধারায়, অধিগ্রহণের পরে, যে কোন সময়ে যে কোন প্রকার জমি ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যদি যাচক সংস্থার (Requiring body) আপত্তি না থাকে।

অন্য ধারাটিতে, প্রকল্প পরবর্তী স্তরে, কোন কৃষিপ্রধান অঞ্চলে জমি যদি উদ্বৃত্ত হয়, সেই উদ্বৃত্ত জমি মূল মালিকদের ফেরত দেওয়ার নির্দেশ আছে। বামফ্রন্ট সরকার, তামিলনাড়ু সরকারের মতো, ইচ্ছাকৃতভাবে মূল ভূমি অধিগ্রহণ আইনে কোন সংশোধনী আনেনি। কারণ, বিশ্বায়নের উদার অর্থনীতির অনুসরণকারী বামফ্রন্টের, বিষয়টিকে বাধ্যবাধকতার স্তরে নিয়ে আসার কোন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের মুখোশ এঁটে মুখটা আড়াল করা বামফ্রন্টের তিন দশকের শাসন-কৌশল। সে যাই হোক, বিষয়টির বৈধতা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ ছিল না। কারণ বৈধতা না থাকলে ম্যানুয়ালেও বিষয়টি স্থান পেত না।

সুপ্রিম কোর্টের ভাষ্য

এর পর এলো সুপ্রিম কোর্ট প্রসঙ্গ। কেরালা সরকার বনাম ভাস্করণ পিল্লাই মামলায় (১৯৯৭) সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখ করে বলা শুরু হলো, শীর্ষ আদালত পূর্বতন মালিকদের জমি ফেরত দেওয়ার দাবি নাকচ করে দিয়েছে। বাধাটা আসলে ছিল কেরালা সরকারের নিজস্ব Kerala Land Assignment Act, 1960 আইনে। এই আইনটি উক্ত রাজ্যের সরকারি জমির ব্যবস্থাপনার আইন। শীর্ষ আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল-

> "The High Court has declared the executive action as invalid in the light of the Kerala Land Assignment Act, 1960 (Act 30 of 1960) (for short, the 'Act'). The high court has pointed out that the assignment is in contravention of the Act... In the present case, what we find is that the executive order is not in consonance with the provision of the Act and is, therefore, invalid." ।
>
> অর্থাৎ প্রশাসনিক আদেশ মূল আইনের প্রেক্ষিতে অসঙ্গত ছিল বলেই অবৈধ ছিল।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

তামিলনাড়ুর আইন

তামিলনাড়ু সরকার ১৯৯৭ সালেই ভুমি অধিগ্রহণ আইনে সংশোধনী এনে 48B ধারা সন্নিবেশ করে। ধারাটি নিম্নরূপ-

"48-B : Transfer of land to original owner in certain cases- Where the Government are satisfied that the land vested in the Government under this Act is not required for the purpose for which it was acquired, or for any other public purpose, the Government may transfer such land to the original owner who is willing to repay the amount paid to him under this Act for the acquisition of such land inclusive of the amount referred to in sub-section (1-A) and (2) of Section 23, if any, paid under this Act."

যে উদ্দেশে জমি অধিগৃহীত হয়েছিল, সেই উদ্দেশে জমি যদি কাজে না লাগে, সেই জমি ইচ্ছুক মালিকদের ফেরত দেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের সমস্ত অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে হবে। এই আইনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল ও সেই বিতর্ক সুপ্রীম কোর্ট অবধি গড়িয়েছিল। কিন্তু কোন নিষেধাজ্ঞা জারি হয় নি। ডিএমকে সরকার যেটা করতে পেরেছিল, বামপন্থী দলগুলো পশ্চিমবঙ্গে সেই কাজটা করে উঠতে পারলো না।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন তৃণমূল জোট সরকার প্রথমে বলেছিল, অধিগ্রহণ আইনে তামিলনাড়ু ধরনের সংশোধন করে সিঙ্গুরে 'অনিচ্ছুক' চাষিদের জমি ফেরত দেবে। শুধু আইন সংশোধন করে সিঙ্গুরের সমস্যা মিটবে না। সিঙ্গুরের কতকগুলি বাস্তব সমস্যা আছে, আইন প্রণয়ন কালে যেগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, এটি একটি সার্বিক সমস্যা। অধিগৃহীত জমি শুধু সিঙ্গুরে আছে, তা তো নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জমির চাহিদা তো সেখানেও আছে। ফেরত দিলে, সেগুলোও ফেরত দেওয়া উচিৎ। সুতরাং প্রস্তাবিত আইনটি সিঙ্গুর-কেন্দ্রিক না হয়ে একটা সার্বিক আইন হওয়া প্রয়োজন।

সিঙ্গুরের বাস্তবতা:

সিঙ্গুরের সমস্যাগুলি কী?

১) ব্যবহারিক দিক থেকে, টাটা কোম্পানীর জন্য অধিগৃহীত ৯৯৭.১১ একরের প্রায় সমস্ত জমির চরিত্র বদল হয়ে গেছে। কিছু অংশে নির্মাণ কাজ হয়েছে, বাকি জমিগুলি হয় এখন ঘাস-বন না হয় উঁচু-নীচু অসমান জমি। এই জমি ফেরত পেলেও চাষ করা যাবে না, যদি না সরকার জমিগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। কৃষকদের দাবিও তাই— সরকারি ব্যয়ে ফেরত দেওয়া জমিকে কৃষিযোগ্য করে দিতে হবে। স্বল্পমেয়াদের জন্য অধিগৃহীত জমির পুনর্বহালের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ জমির জন্য খেসারত দেওয়ার বিধান অধিগ্রহণ আইনে আছে। এ ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্থ জমির জন্য উপযুক্ত খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২) জমির সীমানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জরিপ করে, পুরাতন রেকর্ডের সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে এবং পূর্বতন সকল অধিকার বজায় রেখে জমি ফেরত দিতে হবে। অর্থাৎ, আগে যাদের পাট্টা ছিল, তাদের পূর্বতন পাট্টা বহাল থাকবে এবং আগে যারা রায়ত ছিল, তাদের রায়তি স্বত্ব বজায় থাকবে।

৩) ২০০৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর সরকার অধিগৃহীত জমির দখল নিয়েছিল। সেই তারিখ থেকে প্রতিটি জমির মালিক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের জীবিকা-হানির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪) জমি যদি একান্তই চাষের অযোগ্য হয়, তবে সংশ্লিষ্ট কৃষককে তাঁর নির্দ্দিষ্ট জমি থেকে আয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

যে প্রশ্নটা জরুরি, সেটা হলো সরকার বা তৃণমূল দল সেই কৃষকদেরই জমি ফেরত দেওয়ার কথা ভাবছে, যারা ক্ষতিপূরণ নেয় নি। তামিলনাড়ু আইনে কিন্তু বিষয়টা সেভাবে নেই। তামিলনাড়ু আইনে তো আর ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক বিষয়টা ছিল না। যে জমি অব্যবহৃত, তামিলনাড়ু আইন শুধু সেই জমিটুকুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অব্যবহৃত জমির সমস্ত মালিকই প্রত্যর্পণের দাবিদার হতে পারে। সেটাই হওয়া উচিত। এখন যা অবস্থা, সিঙ্গুরে সমস্ত জমিটাই অব্যবহৃত হিসাবে গণ্য হতে পারে। সুতরাং দাবিদার সকলেই হতে পারে। আইনে বৈষম্য করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। অর্থাৎ টাকা ফেরত দিয়ে, কেউ যদি জমি ফেরত নিতে চায়, তার দাবির সংস্থানও আইনে রাখতে হবে।

লীজের শর্ত

সিঙ্গুরে মোট ৯৯৭.১১ একর অধিগৃহীত জমির মধ্যে টাটা মোটর্সকে সরাসরি লীজ দেওয়া হয়েছে ৬৪৫.৬৭ একর জমি। এর বাইরে সরকারের হাতে আছে বাকি ৩৫১.৪৪ একর অধিগৃহীত জমি এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের থেকে নেওয়া আরও ১.৫৮ একর জমি, একুনে ৩৫৩.০২ একর। এর মধ্যে ভেন্ডারদের জন্য চিহ্নিত ছিল ২৯০ একর জমি। যতদূর জানি, কয়েকজন ভেন্ডারকে দখল দেওয়া হলেও কোন লীজ চুক্তি সম্পন্ন হয় নি।

রাজ্য সরকাবের সঙ্গে টাটা কোম্পানির চুক্তি হয়েছিল ২০০৭-এর ৯ মার্চ। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা কে কতটা পাবে এবং দেবে, সেটা ৯ মার্চ স্থির হয়ে গিয়েছিল। এই চুক্তিটি বামফ্রণ্ট সরকার প্রকাশ করে নি, বর্তমান তৃণমূল সরকারও প্রকাশ করে নি। ১৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প নিগম টাটা মোটর্সের সঙ্গে ৬৪৫.৬৭ একর জমি ব্যবহারের জন্য লীজচুক্তি করে। এই জমিটি সম্পূর্ণরূপে অটোমোবাইল কারখানার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে যে শর্তে লীজদাতা শিল্প নিগম লীজ বাতিল করতে পারে, সেগুলি হলো

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ক) লীজগ্রহীতা টাটা মোটর্স যদি লীজ চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে লীজ-জমি ব্যবহার করে অথবা ৩ বছরের মধ্যে উদ্দিষ্ট কাজে উক্ত জমি যদি ব্যবহার করতে না পারলে, খ) ক্রমান্বয়ে তিন বছর জমির ভাড়া (প্রথম পাঁচ বছর ১ কোটি টাকা) বাকি পড়লে, অথবা গ) উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্র ছাড়া লীজগ্রহীতা যদি অন্যভাবে শর্তভঙ্গ করে, তাহলেও উচ্ছেদের সম্মুখীন হবে। কোন ক্ষেত্রেই বিনা নোটিশে কিছু করা যাবে না এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই লীজগ্রহীতাকে শর্ত পূরণের যথেষ্ট সুযোগ ও সময় দেওয়া আছে। অপর দিকে লীজদাতার তরফে শর্তভঙ্গ হলে, টাটা কোম্পানিও একতরফা লীজ বাতিলের অধিকারী ছিল।

লীজচুক্তির সপ্তম ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারায় বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ ইত্যাদি অচিন্তনীয় ঘটনার (Force Majeure) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে যদি বিলম্ব হয় বা দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, কোন পক্ষই দায়ী থাকবে না এবং এই রকম ঘটনাজনিত বিলম্বের পর্বে লীজচুক্তির যাবতীয় শর্তাদি মুলতুবি (suspend) থাকবে।

পঞ্চদশ ধারায় বলা হয়েছে, চুক্তির কার্যকারিতা, ব্যাখ্যা, অধিকার ও দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে, সেটি একটি সালিশি সভায় (panel of Arbitrators) প্রেরিত হবে। উভয় পক্ষ একজন করে ব্যক্তিকে মনোনীত করবে। মনোনীত ব্যক্তিরা সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে সালিশি সভার সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করবেন।

জমি পুনর্গ্রহণে সমস্যা কোথায়

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে টাটা সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যায়। টাটার সঙ্গে সঙ্গে অনুসারী শিল্পগুলিও স্থানত্যাগ করে। আড়াই বছরের বেশি সময় টাটাকে প্রদত্ত লীজ-জমি সহ অন্যান্য জমি অব্যবহৃত পড়ে আছে। কিন্তু টাটা কোম্পানি জমির ভাড়া প্রতি বছর রাজ্য সরকারের কোষাগারে জমা দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ভাড়া বাকির দায়ে টাটাকে অভিযুক্ত করা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা তো ঠিক, তিন বছরের বেশি সময় হয়ে গেল (২০০৭ সাল থেকে ধরে), লীজচুক্তিতে ঘোষিত উদ্দেশ্যে লীজ গ্রহীতা জমিটি ব্যবহার করতে পারে নি। রতন টাটা যে কারণেই দেখাক না কেন, চুক্তির সপ্তম ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে দায়ী করা যায় না। অতএব, একটা নোটিশ দিয়ে, চুক্তি বাতিলের কোন অসুবিধা আছে বলে তো মনে হয় না। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছার।

রতন টাটা বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, কোম্পানি যে বিনিয়োগ করেছে, তার ক্ষতিপূরণ না পেলে, তাঁরা জমি ছাড়বেন না। চুক্তি অনুযায়ী এই দাবি বেআইনি। টাটাদের পিছনে রাজ্য সরকারও কম টাকা ঢালে নি। টাটারা সিঙ্গুরে কত টাকা খরচ করেছে, তার কোন হিসেব এখনও পর্যন্ত দেয় নি। *দি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার (০২/০৯/০৯) সংবাদ অনুযায়ী সিঙ্গুরে টাটাদের ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ আটকে আছে। মহা হিসাব পরীক্ষকের (Comptroller And Auditor General of India) ২০০৬-০৭ সালের রিপোর্ট বলছে, সিঙ্গুরের জমির জন্য শিল্প নিগমের প্রত্যক্ষ খরচ হয়েছিল ১৬০.৬০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের থেকে মৃদু ঋণ দেওয়া হয়েছিল ২০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়োগ, যানবাহন ইত্যাদির খাতেও বিপুল খরচ হয়েছে। এর পর জমি ফেরত দেওয়ার খরচ যোগ করলে টাটার থেকে উল্টে কিছু পাওনা হয়। সেটা টাটা মশাইরা দেবেন তো?

সব থেকে বড়ো কথা, টাটাদের একদিনের জন্যও লোকসান বহন করতে হয় নি। গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী সরকার ন্যানো কারখানাব জন্য তিরিশ হাজার কোটি টাকার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। তার মধ্যে সিঙ্গুর থেকে যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম সরানোর খরচ বাবদ ধরা হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা। ৯৫৭০ কোটি টাকার মৃদু ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে, ২০ বছর বাদে যেটার বার্ষিক ০.১ শতাংশ সুদে শোধ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে (সূত্র— *দি হিন্দু*, ১২/১১/২০০৮)। বাম রাজ্যের লোকসান রাম রাজ্যে পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন মুখে টাটারা টাকা চায়? নির্লজ্জতাও যে লজ্জা পাচ্ছে।

অপর দিকে সিঙ্গুরের কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের কথা একবার ভাবুন। পাঁচ বছরের বেশি হয়ে গেল, জমি থেকে তাদের কোন রোজগার নেই। কৃষকদের কেউ কেউ আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। কিন্তু বর্গাদার, ক্ষেতমজুররা? তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যার রাস্তাতেও হাঁটতে বাধ্য হয়েছে। অতঃ কিম?

২০০৭ সালের ২৮ মার্চ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এক আদেশে টাটা মোটর্স কোম্পানিকে সিলিং অতিরিক্ত জমি দখলে রাখার অনুমতি দেয় (আদেশ নং ১৫৭৪-এল.আর)। প্রতি বছর টাটা মোটর্সের ভূমি সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেওয়ার কথা। আদেশে তিন বছরের মধ্যে জমির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। টাটা মোটর্স কোন কিছুই করেনি। এই আদেশ এখনও বহাল থাকে কী করে? অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার করা হোক।

আইন যা সংশোধন হওয়ার হোক। কিন্তু এখনই টাটাদের থেকে জমি নিয়ে নিতে বাধাটা কোথায়? পরিবর্তনটা এখান থেকেই শুরু হোক না।

সংযোজন : লেখাটি যখন যন্ত্রস্থ, সেই সময়ে ১৪ই জুন ২০১১ বিধানসভায় "The Singur Land Rehabilitation & Development Bill, 2011" পাশ হয়ে যায়। এটি সার্বিক আইন নয়, শুধুমাত্র টাটাকে দেওয়া সিঙ্গুরের জমি উদ্ধারের জন্যই আইনটি আনা হয়েছে। সুতরাং সার্বিক আইন প্রণীত হবে কি না, সেই প্রশ্নটা থেকেই গেল।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

প্রবন্ধ

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই

সঞ্জীব আচার্য্য

কুলতলির এসইউসিআই বিধায়ক প্রবোধ পুরকায়েত। দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাস করে, প্রশাসনকে ব্যবহার করেও সিপিআইএম দল এই অঞ্চল থেকে এসইউসিআই-কে উৎখাত করতে পারে নি। তাই আঞ্চলিক একটি হত্যা মামলায় (২০ বছর পুরানো) জড়িয়ে দিয়ে প্রবোধ পুরকায়েতের যাবজ্জীবন কারাবাস নিশ্চিত করে দিল বামফ্রন্ট সরকার। এখনও সেই কারাবাস চলছে। সিপিআইএম দলের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করার পুরস্কার।

জাঙ্গীপাড়া, রাজবলহাট অঞ্চলে সিপিআইএম দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের মরূদ্যানে দুঃসাহস দেখিয়ে খেতমজুরদের সংগঠিত করে আন্দোলনে নেমেছিলেন পতিতপাবন হালদার, বরুণ সুরেরা। সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরিরও অনেক কম মজুরি দাবি করে আন্দোলন করেছিলো খেতমজুরেরা। সিপিআইএম দলের কাছে এটা দুঃসাহসী জঙ্গিপনা। তাই পতিতপাবন, বরুণ সুরেরা 'মাওবাদী' তকমা নিয়ে আজ জেলবন্দী। সিআইডি নিজেদের লোককে এনে মিথ্যা সাক্ষ্য পেশ করে দণ্ডদান নিশ্চিত করেছে।

নন্দীগ্রামের তৃণমূলকর্মী গৌরহরি দাস নন্দীগ্রামে জমি বাঁচাও কমিটির নেতৃত্ব দিয়ে স্থানীয় মানুষকে সাথে নিয়ে সিপিআইএম দলের হার্মাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আজও তার ঠিকানা জেলখানার অন্ধ কুঠুরি।

নন্দীগ্রামেরই জমি রক্ষা লড়াইয়ে সিপিআইএম দলের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন হলদিয়ার মধুসূদন হালদার। একইভাবে নন্দীগ্রামে হার্মাদদের আটকাতে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন দীপক, সুদীপ, অশোকেরা। এর প্রতিশোধ নিতে এই প্রতিরোধী লড়াকুদের জেলে ভরেছেন বামফ্রন্ট সরকার। সিপিআই-মাওবাদী দল করার অপরাধে। হার্মাদদের পরাজয় হয়েছে। হার্মাদদের ব্যবহার করে যারা ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল সেই বামফ্রন্ট সরকারও জনরোষে, গণ-ঘৃণায় বিসর্জিত। তবু আজও এরা জেলের অন্ধকারে।

গণ-আন্দোলনের কর্মী প্রসূন চ্যাটার্জী ও প্রদীপ চ্যাটার্জী দুই ভাই-ই জেলবন্দী। বাড়িতে রয়েছেন তাদের ক্যানসার আক্রান্ত বাবা ও হৃদরোগী মা। প্রসূনরা বামফ্রন্টের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগঠিত করে-ছিলেন ছত্রধর। পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটি নাম দিয়ে। শত শত কর্মী-সহ ছত্রধরের আস্তানা আজ জেলের কোনও অন্ধকার সেল।

গত চৌত্রিশ বছরে এরকম টুকরো টুকরো ঘটনার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বহর ব্যাপক এবং গভীর হয়ে সামাজিক অন্যায়ের মহাভারত তৈরি করেছে। জরুরি অবস্থার সময়কালীন সরাসরি কালা আইনের বর্শাফলক ছাড়াই শুধুমাত্র প্রশাসনকে ব্যবহার করে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় দ্বি-জাতি তত্ত্বের এক নতুন শাখা তৈরি হয়েছে। বিরোধী দলের কোনও কর্মী শুধুমাত্র পোস্টার লাগানোর অপরাধে জেলবন্দী আর ছোটো আঙারিয়া, নানুর, করন্দা, নন্দীগ্রাম, বেলপাহাড়িতে অসংখ্য মানুষের প্রাণ কেড়ে-নেওয়া তপন-সুকুরেরা 'দলীয় সম্পদ' হয়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে সভাপতিত্ব করার জন্য মুক্ত আকাশের নীচে রজনী-গন্ধার মালায় শোভিত হয়েছেন। গণতন্ত্রের আলখাল্লার ভিতরে নখাগ্র তীক্ষ্ম হয়েছে দলতন্ত্রের।

গত চৌত্রিশ বছরে সিপিআইএম দলের নেতৃত্বে প্রশাসনিক ও দলীয় সন্ত্রাস ধাপে ধাপে এক অসহনীয় অবস্থা তৈরি করেছিলো। পার্টির অনুমতি ছাড়া কিছু করা মানেই হয় 'সমাজবিরোধী' অথবা 'সন্ত্রাসবাদী'। এর বিরুদ্ধে যারা মানুষের হয়ে কিছু করার চেষ্টা করেছেন তাদের বহু লোকই আজ কারাগারের অন্তরালে। সেইসব রাজনৈতিক বন্দী ও তাদের পরিবারের লোকজন আশায় বুক বেঁধে আছেন কবে এই সন্ত্রাসরাজ শেষ হবে। কবে আবার ভাই-দাদা-বাবা কিংবা মায়ের সাথে মুক্ত আকাশের নীচে দেখা হবে। জেলের দারোয়ানকে পয়সা দিয়ে বাবার মুখ দেখার জন্য ছেলেকে অপরাধীর মতো জেলের গেটে অপেক্ষা করতে হবে না। এদের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। আজ মানুষ সেই সন্ত্রাসরাজের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে এক নতুন সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। এই সরকারের দায়িত্বে যারা তারাও নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টের সন্ত্রাসরাজের অবসান ঘটিয়ে নতুনভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জেলবন্দী ঐ মানুষজন ও তাদের পরিবারবর্গ আশা করে তাদের মুক্তি হবে। তাই নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশার শীর্ষে চলে আসে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি। বিগত দিনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল যাঁরা তাঁদের সম্মানের সাথে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে না এনে গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হতে পারে না।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন, রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দোলনে ভূমিকা অথবা তাদের স্ত্রী-সন্তান-মায়েদের কথা ভেবে তাদের বন্দীদশা সম্পর্কে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু তাই বলে আইনের চোখে একজন অপরাধী অথবা অভিযুক্তকে ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? প্রচলিত আইনি কাঠামোর ভিত্তি নড়ে যাবে না কি? গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হবে না তো? আবেগের কাছে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

যুক্তি ও সামাজিক নৈতিকতাকে সমর্পণ করা হয়ে যাবে না তো? এসব প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে— না। গণতন্ত্রকে ভিত্তিমূল থেকে দেখলে একটা পালাবদলের সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিটা শুধুমাত্রা বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের আবেগনিঃসৃত নয়— এটা এতটা নৈতিক এবং গণতান্ত্রিক দাবি। এই দাবি অন্যায়কে শুধরে নিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম সামাজিক কর্তব্য।

মনে রাখা দরকার, এরা কেউই ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থসিদ্ধি করার কারণে শাসকদল তথা সরকার তথা প্রশাসনের রোষে পড়ে নি। শুধুমাত্র সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য, সন্ত্রস্ত ও মানিয়ে নেওয়া জড় সমাজের মাঝে শাসকের রাঙানো চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো— 'তোমার হুকুম মানছি না'। তাই শাসকের চোখে, ক্ষমতায় থাকতে চাওয়া সরকারি দলের চোখে এরা অপরাধী। মানুষের কাছে এরা শ্রদ্ধেয় বীর। তাই তারা মানুষেরও আপনার জন। তাই তাদের মুক্তির দাবিটা শুধুমাত্র পারিবারিক নয়— সামাজিক। নৈতিকতার গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়েই তারা আজ বন্দী। তাই তাদের মুক্তি দেওয়াটাও গণতন্ত্রকে উদ্ধার করতেই। এটা এই সন্ধিক্ষণের ঐতিহাসিক দাবি।

সব নির্বাচনের পরেই কিন্তু রাজনৈতির বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি প্রাসঙ্গিক বা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয় না। যেমন, সব নির্বাচনের আগে এই প্রশ্নটা উঠেও আসে না। একটা উল্লেখযোগ্য সময় ধরে রাষ্ট্র-দল-সরকারি সন্ত্রাসে সমাজ বিদীর্ণ হলে, বিরোধী মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিহ্ন করতে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয় তাদেরই, যারা এই সন্ত্রাসকে মানিয়ে নিয়ে পোষ্য কিংবা জীবন্মৃত হতে চায় না। একটা বড়ো সময় ধরে এটা চললে দেখা যায় যে, আইনি শাসন-নির্ভর গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়ে গেছে। জলাশয় ভরাট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে একজন হয় জেলবন্দী অথবা তপন দত্তর মতো শহীদ আর প্রমোটর-নেতা-আধিকারিক ত্রি-বেণী সঙ্গমে যুদ্ধ জয়ের উল্লাস। নন্দীগ্রামে হার্মাদ ঠেকাতে জনগণের হয়ে লড়াই করা মধুসূদনরা জেলে আটক থেকে আর লক্ষ্মণ শেঠ, তপন, সুকুরেরা প্রশাসক দলের সম্পদ হয়ে ওঠে। বাধাহীন বেপরোয়া অনৈতিক সরকারি দলীয় সন্ত্রাসের চাবুকে গণতন্ত্রের সারা গায়ে দগদগে ঘা। বে-আইনি ও মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার ও সাজাদানের রক্তাক্ত নকশায় ন্যায়বিচার মুক্তি চাইছে। তাই এই ধরনের পালাবদলের সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তিদানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুরানো পাপ ধুয়ে পবিত্রই হবে। আইনি মূল্যবোধ বা গণতন্ত্রের প্রাথমিক ধারণা কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। বরং উল্টোটা হলে প্রশ্ন উঠবে, যাদের ত্যাগে, যাদের সাহসে গণতন্ত্রের ঘাড় থেকে সন্ত্রাসের জগদ্দল সরে যেতে বাধ্য হলো, তাদের মুক্তির প্রশ্নে দ্বিধান্বিত হওয়াটা ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যাচ্ছে কিনা?

রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির প্রশ্নে সামাজিক, নৈতিক ও গণতান্ত্রিকতার ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার সম্ভাবনা মেনে নিয়েও কারও কারও মনে হয়তো তবুও দ্বিধা থেকে যেতে পারে। এই পালাবদল তো এই প্রথম হলো এমন নয়। ইতিহাসে এমন উদাহরণ আর আছে কী? হ্যাঁ, রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির, নিঃশর্ত মুক্তির ঘটনাও ইতিহাসে বারে বারে ফিরে এসেছে General Amnesty নামে। General Amnesty for Political Prisoners কখনও বা আরো উদারভাবে General Amnesty for Prisoners। ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় চার্লস, ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের ক্ষমতাসীন হবার পরও একই দাবি উঠেছিল। কারণ সেদিনও সন্ত্রাসের এক কালো জমানার অবসানে নতুন প্রভাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালাবদল ঘটেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড চুক্তির ভিত্তিতে 'ফরগেট অ্যাণ্ড ফরগিভ' বলে এমনকি আলিপুর বোমা মামলায় আন্দামানে আটক সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালে গান্ধীআরউইন চুক্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও 'হিংসার সঙ্গে যুক্ত' অজুহাতে সশস্ত্র পথযাত্রীদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। ফলে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জেলের ভেতর আটক বিপ্লবীরা অনশন আন্দোলন শুরু করার পর ১৯৩৭ সালে তাঁরা সবাই মুক্তি পান। আর সাম্প্রতিকালে এই পশ্চিম-বাংলাতেও জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গণ-রায়ের পরিণতিতে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হবার পর প্রথম যে প্রত্যাশা সেই সরকার পূরণ করতে বাধ্য হয়েছিল তা হলো সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি। বর্তমান সময়েও আর্মেনিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া— বহু দেশেই জমানা বদলের পর প্রথম গর্বিত ঘোষণা— সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি।

ইতিহাসের বুকে এই দাবি দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে বারে বারে ফিরে এসেছে। যদি গত চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট জমানায় সন্ত্রাস ও বিরোধীদের মতপ্রকাশের অধিকারহীনতার প্রকৃত বিরোধিতা করতে হয়, তাহলে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি না মানলে সেই বিরোধিতাই বরং অর্থহীন হয়ে পড়ে, অভিযোগের মর্মবস্তু পড়ে যায় প্রশ্নের মুখে।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া উচিত বলে মেনে নিলেও যে প্রশ্ন উঠতে পারে তা হলো, কোনও দাবি যতই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হোক তা রূপায়ণ তো করতে হবে একটা নির্বাচিত সরকারকে। এই দাবি রূপায়ণে আইনি কোনও জটিলতা নেই তো? এ প্রসঙ্গে বলা যায়, রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে কারা গণ্য হবেন সে বিষয়ে সরকারের আইনেও কিন্তু যে সমস্ত বন্দী রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত তাদের সকলেই 'রাজনৈতিক বন্দী'। কারও বিরুদ্ধে কোন্ ধারায় মামলা হয়েছে সেটার উপর রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাওয়া আটকাচ্ছে না। রাজনৈতিক কোনও ঘটনায় জড়িত কোনও বন্দী যে অভিযোগেই অভিযুক্ত হোক না কেন, তিনি রাজনৈতিক বন্দী।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

‘ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ১৯৯২’ অনুসারে রাজনৈতিক বন্দী হলেন :

"Any person arrested or convicted on a charge of having committed or attempting to commit aiding or abetting the commissions of any political offence, where or not the act constituting such offence comes within the perview of any offence punishable under the Indian Penal Code or any other law for time being in force, or any person behind to have been prosecuted out of political animosity or grudge, shall be classified as political prisoner." (Chapter VII, 24-(31), v.)

অর্থাৎ ‘রাজনৈতিক’ বন্দীর যে সংজ্ঞা আইনে বলা হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে, কোনও বন্দীর বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ যতো গুরুতরই হোক না কেন, সেটা তার রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাওয়ার পথে কোনও বাধা হবে না। ব্যক্তিগত কোনও লোভ বা ধান্দার কারণে ঘটিত কোনও অপরাধ না হলেই হলো। রাজনৈতিক পরিচয় বা আদর্শ যাই হোক না কেন, রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট কোনও ঘটনার অভিযুক্তরা সকলেই রাজনৈতিক বন্দী। এমনকি তার বিরুদ্ধে ৩০২ ধারা (হত্যার অভিযোগ) থাকলেও। অর্থাৎ সরকার যদি নীতিগতভাবে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার দাবি অথবা প্রতিশ্রুতি মেনে নেয়, তাহলে কারও মুক্তি হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে ভাগ করা ঠিক নয়।

তাই রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি (General Amnesty for political prisoners) এই সময়ের মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক দাবি এবং এই দাবি পূরণের ক্ষেত্রে সরকার চাইলেই সরকারি আইন অনুযায়ী ‘রাজনৈতিক বন্দী’-র সংজ্ঞা ব্যবহার করে মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। রাজনৈতিক বন্দীর সংজ্ঞা পেলেও অনেকে ভাবতে পারেন যে, তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারের কোনও আইনি ক্ষমতা আছে কিনা। প্রচলিত আইন ব্যবহার করেই কোনও রাজ্য সরকার অভিযুক্ত অথবা সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তি দিতে পারে। সিআরপিসি-র ৩২১-নং ধারা মোতাবেক বিচারাধীন অভিযুক্তদের এবং ৪৩২-নং ধারা অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে যে কোনও মামলা রাজ্য সরকার তুলে নিতে পারে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের (আইপিসি) ৫৫-সহ অন্যান্য কয়েকটি ধারাতেও রাজ্য সরকারের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া আছে। এছাড়া সংবিধানের ৭২-নং ধারায় রাষ্ট্রপতির হাতে এবং ১৬১-নং ধারায় রাজ্যপালের হাতে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা রদ করে মুক্তি দেওয়ার অধিকার দেওয়া আছে। ইতিহাসে এর নজিরও আছে। সুতরাং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী যারা সরকারের বিরুদ্ধে, শাসক দলের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে আটক হয়েছে তাঁদের সকলকেই আইন মোতাবেক মুক্তি দেওয়া সম্ভব। কারো বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ থাকলেও আইনের পথে সেটা কোনও বাধা নয়। মূলত, সবটা নির্ভর করছে নতুন নির্বাচিত সরকার এদের মুক্তি হোক সেটা চাইছেন কিনা তার ওপর। ফলত, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টা নতুন সরকারের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর, নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সরকারের সদিচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

এমন প্রশ্নও কারও মনে হতে পারে যে, ইউএপিএ-র মতো বিশেষ আইনে (কালা আইন) যাদের ধরা হয়েছে তাদের ছাড়া উচিত কিনা, কিংবা ছাড়া যাবে কিনা। প্রথমত, যে কোনও কালাকানুনের মত ইউএপিএ আইনও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য তৈরি একটি অগণতান্ত্রিক ও বেআইনি আইন(!)। ন্যায়বিচারের এবং সংবিধান-প্রদত্ত সাধারণ অধিকারের ধারণাও এই কালা আইনের দ্বারা লাঞ্ছিত। সরকার ও শাসকদলের বিরুদ্ধে ন্যূনতম প্রতিবাদ, এমনকি বিরোধিতাও যাতে গড়ে না ওঠে তার জন্যই এই আইন। সুতরাং এই আইনে আটক সকলকেই অবিলম্বে মুক্তি দেওয়াটাই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ। এ বিষয়ে যে বিশেষ ব্যাখ্যা ও যুক্তির দরকার নেই এটা বর্তমান সরকারও স্বীকার করবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আইনে এর কোনও বন্দোবস্ত আছে কিনা? রাজনৈতিক বন্দীর সরকারি সংজ্ঞাতে এ বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে। সাময়িক কোনও বিশেষ আইনে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও তিনি রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাবেন যদি তার ঘটনাটা রাজনৈতিক হয়।

কোনও কোনও সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (সিপিআই-মাওবাদী, সিমি) সেই দলের বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করে রাখা আছে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও। তাদের অপরাধ হল তারা সরকার নির্ধারিত নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য। কোনও সংগঠনকে রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে মোকাবিলা না করে শুধুমাত্র ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষণা করে সংগঠনের কাজকে স্তব্ধ করার অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আমরা সবসময় নিন্দা করি। ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষণা করলেও কোনও সংগঠনের বক্তব্য সমাজ থেকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া যায় না। বরং তা ভিন্নরূপে সমাজের স্বাভাবিক গণতন্ত্রকে ব্যাহত করে। সরকার বা শাসকদল তার অপছন্দের কোনও কিছু আটকানোর জন্য মতপ্রকাশের অধিকার এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে কেড়ে নিতে চায়। এ বিষয়ে গণতন্ত্রপ্রিয়, অধিকারবোধ-সম্পন্ন কারুরই কোনও দ্বিধা থাকার যুক্তি নেই। তাই ‘নিষিদ্ধ’ সংগঠনের সদস্য হিসাবে যারা বন্দী রয়েছেন তাদের মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নে এই সরকারের কোনও দ্বিধা থাকার কথা নয়। কারণ বর্তমান নির্বাচিত সরকার পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমতের

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ফসল। বিগত কয়েক বছরে পূর্বতন শাসকদল নিজেরা প্রশাসনকে ব্যবহার করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে এবং তার সাথে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে বিরোধীদের মতপ্রকাশের ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এর উপর অন্যায়ভাবে কয়েকটি সংগঠনকে 'নিষিদ্ধ' তকমা লাগিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে তাদের জেলবন্দী করেছে। এদের মুক্তির দাবি নিয়ে দ্বিধা বরং এদের গ্রেপ্তার করাকেই বৈধতা দেবে। সংগঠনকে 'নিষিদ্ধ' করার অবৈধ প্রক্রিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নেবে। সেটা হবে প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে আরও বড়ো বিপদ। তাই কোনও সংগঠনকে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করাটা যতোটা অন্যায়, যতোটা অগণতান্ত্রিক, যতোটা অনৈতিক, নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হিসাবে যারা বন্দী রয়েছেন তাদের মুক্তির দাবিটা ততোটাই ন্যায়, ততোটাই গণতান্ত্রিক এবং ততোটাই নৈতিক। গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে দলতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা যারা করেন কিংবা যারা বামফ্রন্টের আমল শাসকদল তথা সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা বা নৈতিকতা নিয়ে নিঃসংশয়, অথচ রাজনীতিতে বা সমাজে সামগ্রিকভাবে হিংসার অবসান চান, তাদের কারও কারও মনে হয়তো এরপরেও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাওয়ার প্রশ্নে দ্বিধা থেকে যেতে পারে। কেউ ভাবতে পারেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে শাসকদল তথা সরকার ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়, অন্যায় জুলুম করে এটা সত্য। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও তো কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিংসার ঘটনা ঘটায়, যা হয়তো অন্য কোনও মানুষের জীবনের অধিকার হরণ করে। বিরোধীদলের যে সব কর্মীরা এ ধরনের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে জেলবন্দী তাদের হিংসাকে স্বীকৃতি বা প্রশ্রয় দেওয়া হবে না তো? বা তাদের অধিকার হরণের দায়কে আড়াল করা হয়ে যাবে না তো? ভাবনা আসতে পারে যে, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাওয়ার দাবি করলে সকলের মতপ্রকাশের অধিকার বা জীবনের অধিকারের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হবে না তো?

এই প্রশ্নে আমাদের, প্রথমত, দৃঢ়ভাবে জানানো দরকার যে, আমরা সমাজজীবনে যে কোনও বলপ্রয়োগ বা হিংসার প্রয়োগের বিরোধী। পূর্বেও আমরা দল-নিরপেক্ষভাবে যে কোনও রাজনৈতিক দলের হিংসাকে, মতপ্রকাশের অধিকারের উপর আক্রমণকে নিন্দা করেছি, এখনও করে যাবো। সেই হিংসা শাসকদলেরই হোক, বিরোধীদলেরই হোক। কোনও রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাওয়া মানে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করা নয়। এ প্রত্যয় রেখেই এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকতে হবে যে, যে রাজনৈতিক হিংসাকে আমরা নিন্দা করছি সেই হিংসায় অভিযুক্তদের মুক্তি চাইছি কেন? কোন্ যুক্তিতে?

প্রথমত, বিরোধীদলের যে সব কর্মীদের বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ আছে, বা শাস্তি হয়েছে, তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগ থেকে শুরু করে শাস্তিদানের সমগ্র প্রক্রিয়াটা সরকার বা শাসকদলের চক্রান্ত। একটা কোনও হিংসার ঘটনাকে সামনে রেখে, কৌশলী এফআইআর-এর অস্ত্রে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে। এই ধরনের চক্রান্তমূলক প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে বিচার করে বার করাই মুস্কিল কে আদৌ হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত, কে জড়িত নয়। ফলে কোনও হিংসাত্মক ঘটনায় অভিযুক্ত বা শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে থেকে বাছাই করতে গেলে বহু নির্দোষ ব্যক্তির মুক্তি আটকে যাবে অথবা আদৌ মুক্তি হবে না। যেখানে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, কোনও হিংসার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করার পিছনে শাসকদলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নটি যতোটা জড়িত, তার থেকে অনেক বেশি কাজ করে হিংসার ঘটনাকে ব্যবহার করে এলাকা থেকে এমনকি এলাকার বহু দূরের বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে আটকে রাখার প্রচেষ্টা। শুধুমাত্র সিঙ্গুর জমি রক্ষার আন্দোলনেই প্রায় ১২০টি বিভিন্ন মামলায় প্রায় ৭০০ জন মানুষকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। বামফ্রন্টের আমলে এটা শাসকদল তথা সরকারের রুটিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিংসার ঘটনায় বন্দীদের সত্যি কারও দায় আছে সেটা ভেবে সিদ্ধান্ত নিলে যারা এতদিন বামফ্রন্টের চক্রান্তের শিকার হয়ে অন্যায়ভাবে জেলবন্দী আছেন, তারা আজও বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে গণ-রায়ের ভিত্তিতে জিতে আসা সরকারের দ্বিধার শিকার হবেন। আইনি শুদ্ধতা, গণতান্ত্রিকতা রক্ষার আন্তরিকতা আসলে 'নিরপরাধ মানুষের ন্যূনতম কোনও শাস্তি পাওয়া উচিত নয়'— এই নৈতিক গণতান্ত্রিকতাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে।

এটা তো গেল টেকনিক্যাল বিষয়। কিন্তু যদি কল্পিত কোনও পদ্ধতিও থাকতো যে কোনও হিংসার ঘটনায় বিরোধীদের কে জড়িত সেটা জানা আছে বা জানা যাবে, তাহলেই কি আমরা তাদের মুক্তি না পাওয়াটা মেনে নিতাম। উত্তর— না। আমরা তাদেরও মুক্তির দাবি করছি। দাবি করছি এই কারণে যে, (এক) যেসব বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন (তৃণমূল, এসইউসিআই, ভূমিরক্ষা কমিটি, কেএলও, কৃষিরক্ষা কমিটি, পুলিশী সন্ত্রাস-বিরোধী জনগণের কমিটি, সিপিআই (মাওবাদী), সিপিআই-এমএল) ও অন্যান্য কর্মীদের বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ রয়েছে, তাদের কেউই ব্যক্তিগত স্বার্থে এই ঘটনায় জড়িত নয়। শাসকদলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি নিয়ে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের আকাঙ্খা থেকেই তাদের এই পরিণতি। তাই এদের বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগের কোনও বাস্তবতা যদি থেকেও থাকে, তা সত্ত্বেও এদের আর পাঁচজন সাধারণ অপরাধীর সাথে একাসনে বসিয়ে দেখা ঠিক হবে না। তাই এদের মুক্তির প্রশ্নে আজ যদি আমরা এদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানুষের সমস্যা নিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র তথা শাসকদলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মহৎ চেতনাকে কোনও গুরুত্ব না দিই, তাহলে সেটা আমাদের

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বড়ো অপরাধ হয়ে যাবে। (দুই) সরকারের জনবিরোধী নীতি অথবা পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিংসায় জড়িয়ে পড়ার পিছনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত হিংসাপ্রীতি বা অগণতান্ত্রিক মনোভাবের থেকেও বেশি দায়ী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস! একদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকে রুদ্ধ করে, প্রশাসনকে দলীয় বাহিনীতে পরিণত করে ন্যায়বিচার পাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে নিজস্ব সরকারি দলীয় সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে সন্ত্রাস তৈরি করে যে পরিস্থিতি বামফ্রন্টের আমলে তৈরি করা হয়েছিলো, তার দায়ই বেশি। জমি বাঁচাতে কিংবা পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সশস্ত্র হার্মাদদের প্রতিরোধ করাটা বাধ্যতা হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছিলো বিরোধী দলের কর্মীদের। সেই পরিস্থিতিতে সরকারের চণ্ডনীতির সামনে আত্মসমর্পণ করে হিংসায় জড়িয়ে না পড়ার বাধ্যতা হয়তো এড়ানো যেত, কিন্তু সরকারের শাসকদলের সন্ত্রাস আটকানো যেত না। তাই একজন বিরোধীদলের রাজনৈতিক কর্মীর হিংসায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও তার মুক্তির দাবিটা পূর্বতন সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ। প্রত্যয়ের সাথে সেদিন যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলো— যে লড়াইয়ে ক্রমশ প্রশস্ত হয়েছে সন্ত্রাসরাজ বিসর্জিত হয়ে নতুনভাবে গণতন্ত্রের যাত্রার পথ, সেই লড়াইকে স্বীকৃতি দেওয়া গণতন্ত্রকে মজবুত করতেই। এতে হিংসাকে প্রশ্রয়দানের মতো পরিহারযোগ্য কোনও অভিযোগে আশঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ ঐ বন্দী মানুষেরা কেউই স্বভাব-অপরাধী নয়। আগামী দিনে গণতান্ত্রিক বাতাবরণে ওরা সমাজের সম্পদ হওয়ার উপযুক্ত, ওরাই আগামী দিনে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সমাজের অগ্রণী বীর হওয়ার মতো কল্‌জের মালিক।

তাছাড়া রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে দুটো উপাংশ আছে। একটা হলো অতীতের কোনও ভুলকে প্রয়োজনে ক্ষমা করে দিয়ে নতুন পরিবেশে তার মনুষ্যত্বকে কাজে লাগানোর মানবিক প্রচেষ্টা। 'জেনারেল অ্যামেনেস্টি' কথাটার মধ্যে 'অ্যামেনেস্টি' শব্দের অর্থ ক্ষমা— "more than pardon"। এই বিশ্বাসের অংশীদার হলে সত্যিকারেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করাটাই মানবিক। যদি কারাগার থেকে সংশোধনাগার হওয়াটাই সাধারণ বন্দীদের জন্য মানবিক বাস্তবতা হয়ে থাকে, তাহলে সেই মূল্যবোধেই বলতে হয় যে, রাজনৈতিক কোনও বন্দীর যদি সংশোধনের প্রয়োজনও হয়, তাহলে আগামী দিনের সন্ত্রাসহীন সামাজিক পরিবেশে মুক্ত আকাশের নীচে রেখেই শুরু হোক তাদের সংশোধন। কারণ তারা আমাদের জন্যই লড়াই করেছিলেন। একজন সাধারণ বন্দীর দণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়ার দাবিকে কেন্দ্র করে 'আইনের শাসন' শিথিল হয়ে যাওয়ার যে আশঙ্কা মাথায় আসে, সেই আশঙ্কা একজন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাওয়ার ক্ষেত্রে আসা উচিত নয়। রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির ঐতিহাসিক দাবির নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা উচিত।

তাই মাওবাদী কিংবা তৃণমূলী, ভূমিরক্ষা কমিটি অথবা জনগণের কমিটি— বিরোধী এই সব দলের বন্দীদের মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অহিংস অথবা হিংসার অভিযোগের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বন্দীদের ভাগ করা ঠিক হবে না। একসাথে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিটাই সঠিক।

কেউ হয়তো এরপরেও প্রশ্ন তুলবেন : সরকারি সন্ত্রাসের আক্রমণ ঠেকাতে দিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধে জড়িয়ে পড়া এক কথা, কিন্তু মাওবাদীরা তো ঘোষণা করেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, রাষ্ট্রকে উৎখাত করার জন্য। এটা সত্যি যে, মাওবাদীদের বহু সদস্য মিথ্যা অভিযোগে, শুধু মাওবাদী হওয়ার কারণে বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আক্রমণ ঠেকাতে হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন— তাদের মুক্তির ক্ষেত্রে কোনও নৈতিক বাধা না থাকলেও, যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত মাওবাদী নিজেরাই আক্রমণকারী অথবা হিংসা যারা করেছে বা অন্যদের জীবন বা অধিকার হরণ করেছে, তাদেরও মুক্তি আমরা দাবি করবো কোন যুক্তিতে?

মাওবাদীদের এই ধরনের হিংসার আমরা বিরোধী এবং আমরা এর নিন্দাও করি। কিন্তু এই বিরোধিতা করার সাথে সাথে আমরা রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির এই দাবির মধ্যে তাদেরও মুক্তি দাবি করি, কারণ ঃ

১) প্রথমত, এটা তাদের রাজনৈতিক দর্শন, ব্যক্তিগত কোনও কামনা-বাসনা-জাত হিংসা নয়।

২) মাওবাদী সমস্যা শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়। আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে নিহিত আছে এই সমস্যার বীজ।

৩) অনুন্নয়নের অপরাধের দায় রাষ্ট্রের অথচ সেই অপরাধ স্বীকার করার পরিবর্তে রাষ্ট্র সন্ত্রাস দিয়ে বন্ধ করতে চায় উন্নয়নের দাবিতে কোনও বিক্ষোভকে।

৪) তাই রাষ্ট্রের জনবিরোধী উন্নয়ন তত্ত্ব ও বল্গাহীন সন্ত্রাসের গর্ভেই গড়ে ওঠে সশস্ত্র প্রতিরোধী সংগ্রামের বাস্তব সম্ভাবনা। সংবেদনহীন ব্যাপক ও গভীর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার নিত্য পরোয়ানার সাথে সাথে প্রতিবাদ করার গণতান্ত্রিক পরিসরটুকু কমতে কমতে যখন 'পয়েন্ট ব্ল্যাংক' ফায়ারিং-এর নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, তখন সশস্ত্র প্রতিরোধ তার যুক্তিগ্রাহ্যতা খুঁজে নেয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে টিকে থাকার বাধ্যবাধকতার বাস্তবতায়। সন্ত্রাস এবং অনুন্নয়নের এই অভিযোগ কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনমতের একটা বড়ো কারণ। তাই মাওবাদী সমস্যাকে নতুন নির্বাচিত সরকারকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখতে হবে। খুঁজতে হবে এর রাজনৈতিক

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

সমাধান। শুরু করতে হবে হিংসা-পাল্টা হিংসার পরিবর্তে আলোচনার ভিত্তিতে সম্ভবপর সমাধান খোঁজার চেষ্টা। মাওবাদী সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের এই উদ্যোগ গণতন্ত্রকে আরও মজবুত করার লক্ষ্য নিয়েই করা দরকার। অধিকার রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে এই পদক্ষেপ আমাদের প্রত্যাশা। এই পদক্ষেপের সূচনা হিসাবেও বটে, এবং বিগত বামফ্রন্টের আমলে মাওবাদী প্রশ্নটিকে ভুয়া সংঘর্ষে হত্যা ও যৌথবাহিনীর নির্বিচার দমন-পীড়ন-গ্রেপ্তারের অগণতান্ত্রিক সরকারি নীতিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যও, বন্দী মাওবাদী নেতাদের মুক্তি দেওয়া দরকার। শুরু করা দরকার আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধানের রাজনীতির।

কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীর সংজ্ঞা অনুযায়ী কিছু রাজনৈতিক বন্দী আটক আছে যারা শাসকদলের সাথে যুক্ত। বরং বলা যায়, শাসকদলের হয়ে বিরোধীদের উপর হত্যা, ধর্ষণ, আক্রমণের ঘটনায় তারা এমন জঘন্য ও নগ্নভাবে জড়িত যে, সরকার তাদের আড়াল করার চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেনি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাইলে তাদেরও মুক্তি দিতে হয়। এইরকম জঘন্য অপরাধের পরেও তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? এই প্রশ্নের সামনে পড়ে দল অভিযোগ নির্বিশেষে 'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবির' বদলে শুধুমাত্র 'সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবির' ধারণাকে বেশি ন্যায়সংগত বা নৈতিক বলে মনে হয়। কিন্তু মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ভাগ সম্ভব নয়। মনের মধ্যে কিছু অস্বস্তি কাজ করবে এটা স্বীকার করে নিলেও, শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত জঘন্য অপরাধী কেউ কেউ ছাড়া পেয়ে যাবে এটা মেনে নিতে হবে। এই মেনে নেওয়াটা কিন্তু শুধুমাত্র 'রাজনৈতিক বন্দীর' সংজ্ঞার ফাঁদে পড়ে নয়। এর পিছনে মানবাধিকারের ধারণাও কাজ করছে। প্রথমত, শাসকদলের হয়ে যারা হিংসার ঘটনায় অভিযুক্ত বা সত্যিকারেই ঘটিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই শাসকদলের হুমকিতে বাধ্য হয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কাজ করেছেন। মূল পান্ডারা অধরাই থেকে গেছেন। তাই এদের শাস্তিদানের মধ্য দিয়ে শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত জবাব দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবির পিছনে যে সামাজিক মানসিকতা কাজ করে তা হলো নতুন গণতন্ত্রের যাত্রার শুরুতে সকলকে আরও একবার সুযোগ দেওয়ার। হিংসার পরিবর্তে নতুন গণতান্ত্রিক ভাবনার শরিক হওয়ার। তার জন্য অপরাধী জেনেও তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার সংশোধিত মানুষ হওয়ার প্রত্যাশায় 'স্বজন হারানো শ্মশানে চিতা তুলবার' পবিত্র ক্রোধকে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজের মহৎ কামনার অশ্রুবারিতে স্নিগ্ধ করার সামাজিক দায় কষ্ট করেও পালন করতে হবে। Truth and reconciliation-এর এই ধারণা থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যর অবসানে নতুন সরকার গঠনের সময় পূর্বতন বহু বর্ণবিদ্বেষী অত্যাচারীকে ক্ষমা করা হয়েছিলো। এই ক্ষমা না করলে হয়ত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া হতো, কিন্তু বর্ণবৈষম্যের বিষাক্ত বীজ সমাজের গর্ভে থেকেই যেতো। বামফ্রন্টের আমলে 'ওরা-আমরা'-র যে বর্ণবৈষম্য নীতি চালু ছিলো তার গরল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে গেলে আজকে আমাদের এই বিভেদকে মনখারাপ করেও মুছে ফেলতে হবে আগামী দিনের গণতন্ত্রকে এই বৈষম্যের হাত থেকে বাঁচাবার স্বার্থে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অত্যাচারী নাৎসিদের বিচার করা হয়েছিলো বিখ্যাত ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে। আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়েছিলো Truth and Reconciliation। বৈষম্যের সন্ত্রাস রাজের অবসানের পর কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ গ্রহণ করবে তা নিয়ে বিতর্ক আন্তর্জাতিক। কিন্তু মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা ও Reconciliation-এর ধারণাকে তুলে ধরাই সামাজিক ও নৈতিক দায়। তাই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি রক্ষা করতে গিয়ে যদি শাসকদলের কয়েকজন ছাড়া পেয়েও যায়, মানিয়ে নিতে হবে।

শাসকদলের অপরাধীর শাস্তি পাওয়াকে নিশ্চিত করতে গিয়ে যদি কোনও নিরপরাধ বন্দীর মুক্তি বিলম্বিত হয় অথবা অনিশ্চিত হয়ে যায় সেটা বরং অনেক বেশি বেদনার হবে। তাই একজনও নিরপরাধ যাতে বাড়তি একদিনও আটকে না থাকে সেটাকে সুনিশ্চিত করাটাই আশু কাজ। তাই নির্দ্বিধায় এই দাবি তোলা দরকার : 'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি চাই'।

একদিকে যে কোনও প্রশ্নে রাজনৈতিক হিংসাকে নিন্দা করা— সেটা শাসকদলই করুক অথবা বিরোধীরা, আবার অপরদিকে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রশ্নে বিরোধী কিংবা শাসক-নির্বিশেষে সকলের (এমনকি হিংসার সাথে যুক্ত থাকলেও) মুক্তি চাওয়াটাকে প্রাথমিকভাবে বৈপরীত্যপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু হিংসাকে নিন্দা করে, হিংসায় জড়িতকে পাল্টাবার সুযোগ দেওয়ার মানবিক মূল্যবোধে এটাই স্বাভাবিক দাবি। হিংসার প্রতি আপসহীন আকুতি থেকে এটাই সঠিক দাবি। একজনও নিরপরাধ বন্দীকে যাতে আটকে থাকতে না হয়, সেটা সুনিশ্চিত করতে গিয়ে যদি দু'একজন শাস্তিযোগ্য বন্দীর মুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও পথ নেই।

এ সমস্ত যুক্তি, ব্যাখ্যা দেওয়ার পরও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবির পাশাপাশি একটা প্রত্যাশা ও একটা সমবেদনা প্রকাশের দায় থেকে যায়। প্রত্যাশা সেই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে, যারা নিজের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজন দিয়ে রাজনৈতিক হিংসাকে মদত দেন অথবা প্রয়োগ করেন। তাদেরও ভাবতে হবে এই হিংসা ত্যাগ করার কথা। তা না হলে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির মূল প্রত্যাশাটাই অধরা থেকে যাবে। যাদের স্বজন রাজনৈতিক হিংসার শিকার সেইসব পরিবারের মানুষের কাছে এ লেখা ন্যায়বিচার না দেওয়ার স্বপক্ষে অক্ষম

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

দলিল হয়ে যাবে, যদি না তাদের বেদনা আমরা ভাগ করে নিই। তার পরিবারের মানুষকে এই সমাজের রাজনৈতিক হিংসার শিকার হওয়া থেকে আটকাতে পারি নি— এই সামাজিক দায় যদি না স্বীকার করে নিই। তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে সমর্থন করেও আগামী গণতন্ত্রের জন্য তাদেরকে কষ্ট চেপে ক্ষমাশীল হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েই একমাত্র সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করতে পারি।

সরকারও রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সেটা সমস্ত বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি নয়। রিভিউ কমিটি করে প্রতি অভিযোগ বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে কে মুক্তি পাবে আর কে পাবে না— কমিটিই ঠিক করবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বন্দীমুক্তির প্রশ্নটিকে আংশিকভাবে স্বীকৃতি দিলেও সম্পূর্ণ নয়, সঠিক নয়। কারণ,

১) কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া সবসময়ই রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে যখন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নটি সামাজিক দাবি হয়ে উঠেছে, তখন বাছাই না করেই সকলপ্রকার রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না।

২) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে অন্যায়ের শিকার এক সামাজিক-রাজনৈতিক বর্গ হিসাবে না দেখে প্রত্যেককে এক একজন ব্যক্তি হিসাবে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। যেটা সাধারণ আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বন্দীমুক্তির স্পিরিটের সাথে একেবারেই মানানসই নয়।

৩) রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে বিভাগ তৈরি করার মাধ্যমে একটা প্রতিবাদী রাজনৈতিক বর্গকে মুক্তিকামী এক ব্যক্তিবিশেষে পরিণত করার অপচেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়।

৪) রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি সামাজিক। রাজনৈতিক এই সন্ধিক্ষণে বিগত অত্যাচারী জমানাকে উপড়ে ফেলার জন্য যারা লড়াই করেছিলো তাদের সম্মিলিত রাজনৈতিক দাবি। কিন্তু কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি অভিযোগ বিচার করে মুক্তিদানের সরকার প্রস্তাব অনুসৃত হলে তা ক্রমশ সরকার ও এক ব্যক্তির পারস্পরিক বিষয়ে পরিণত হবে। এটা কখনই কাম্য নয়।

৫) একজন ব্যক্তির বিচার তো আদালতেই প্রচলিত আইনে হয়। কমিটি যদি বিচারের ভার নেয় সেটা কি আর একটা সমান্তরাল আদালত হবে না? হয়তো আরো একটু মানবিক, আর একটু রাজনৈতিক? সেটা কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রশ্নে কোনও সমাধান নয়। বিচার করে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রশ্নে কোনও ন্যায়বিধান সম্ভব নয়— যেটা আদালতই করুক বা কমিটি।

৬) এই পদ্ধতিতে বিলম্বিত হবে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। কে বাদ যাবে আর কে মুক্তি পাবে তা জানা নেই। সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের অন্তরালে চলে যাবে এই প্রশ্নটি। আরও একবার অবিচারের শিকার হবেন রাজনৈতিক বন্দীরা। তাই এই প্রশ্নে আইনি বিশুদ্ধতা রক্ষার তাগিদ ইতিমধ্যেই অন্যায়ের শিকার হয়ে বন্দী হয়ে থাকা মানুষগুলোর উপর বিলম্বিত মুক্তির অথবা আদৌ মুক্তি না পাওয়ার অবিচারের বোঝা চাপিয়ে দেবে। তাই এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে যখন আইনি পথও রয়েছে।

৭) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়াটাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্য। অন্য কিছু কেন করা হবে? সে প্রশ্নও ওঠা উচিত।

৮) যে পদ্ধতিতে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির কথা সরকার ভাবছে, তাতে মনে হচ্ছে যে সরকার তাদের বিশেষ দয়া করছে। কে কে এই দয়া পাওয়ার যোগ্য সেটা খোঁজার জন্য কমিটি। কিন্তু দয়া নয়, অসম্মান ও অন্যায়ের শিকার হওয়ার প্রতিকার হিসাবে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য।

তাই কমিটি তৈরি করে আলাদা আলাদা করে বিচার করে নয়, বরং বিগত সরকারের আমলের যত রাজনৈতিক বন্দী আছে সকলের নিঃশর্ত মুক্তি দিয়েই কেবল ন্যায় ও বিবেকের দাবিকে বাস্তবায়িত করাটা আবশ্যিক।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবির পাশাপাশি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি না তুললে ন্যায়বিচারের বৃত্তটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিগত বামফ্রন্টের জমানায় একদিকে যেমন বিরোধীদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মকেও অপরাধের তকমা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো শত শত বিরোধী দলের কর্মীকে, অন্যদিকে শাসকদলের এবং পুলিশের কর্মীদের অপরাধমূলক কাজকর্মকে আড়াল করে তাদের দলের অথবা সমাজের অথবা প্রশাসনের 'সম্পদ' বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে বহু অন্যায় করেও পার পেয়ে গেছে শাসকদলের নেতা, কর্মী ও পুলিশ। নন্দীগ্রাম, নেতাই, ছোট আঙারিয়া-সহ অসংখ্য গণহত্যা কিংবা লালমোহন টুডু, সিদু সোরেন-সহ একাধিক ভুয়া সংঘর্ষে হত্যা নীরবে হজম করতে বাধ্য হয়েছে সমাজ। এইসব অন্যায়ের প্রকৃত বিচার হওয়া দরকার, আইনের পথেই। তবেই বিকৃতি কাটিয়ে উঠে নতুন গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু সম্ভব।

সংযোজন

চরম বিস্ময়ের কথা, সিপিআইএম-স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক মানুষের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও, তারই ভিত্তিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার তার বিপরীত পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। নতুন সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে রিভিউ কমিটি গড়ে প্রত্যেক রাজনৈতিক বন্দীর 'কেস টু কেস' পর্যালোচনার ভিত্তিতে তাদের

এর পর ৩৮ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট কী ভুল করেছে

অশোক মিত্র

পুরোপুরি বহুদলীয় একটি গণতন্ত্রের মধ্যে একটি 'লাল জমানা'— তিন দশক ধরে যারা বারবার পুনর্নির্বাচিত হয়ে আসে— এই আজব ব্যাপারের সমাপ্তি ঘটল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে শুধু পরাজিতই হয় নি, একেবারে কচুকাটা হয়েছে। ভোটে তাদের প্রাপ্ত অংশ প্রায় ৫০ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মোটামুটি ৪১ শতাংশ। বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের তিন-চতুর্থাংশ পুনর্নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে কাজ করেছেন এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই বিপর্যয় কেরালায় বামদের অবস্থার বিপরীত। কেরালাতেও নির্বাচন হয়েছে। সরকার-বিরোধী ভোট ঐ রাজ্যে এক নিত্য সত্য। সে রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলী কখনো পর পর দুটি নির্বাচনে একই পার্টি বা একই জোটের ওপর আস্থা স্থাপন করে নি। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবার সেই ট্রাডিশন প্রায় ভাঙতে বসেছিল। পাঁচ বছর আগে তারা যত ভোট পেয়েছিল এবারও শতাংশের হিসাবে তাই পেয়েছে।

মাত্র তিনটি আসনে মাত্র ৯০০টি ভোট যদি অন্যভাবে বণ্টিত হত তা হলেই তারা আবার ক্ষমতায় আসতে পারত। কেরালায় সিপিআই(এম) মুখ্যমন্ত্রী বিরাট ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যরাও সবাই ভালোভাবে জিতেছেন। হিসাবের নিরিখে যদিও বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের এই মতাদর্শে অটল ৮৭ বছর বয়সী যোদ্ধা যিনি এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল; ওখানে সিপিআই(এম)-এর মনোবলও অক্ষুণ্ণ।

কিন্তু পূর্বের রাজ্যটিতে যে ভয়ানক বিপর্যয় ঘটেছে, কেরালার ঘটনা দিয়ে তা পূরণ হবে না। কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টিকে যারা একই রকম অপছন্দ করে, প্রেরণার জন্য, দেশের অ-সুবিধাভোগী বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামে পথপ্রদর্শনের জন্য, অনুপ্রেরণার জন্য যারা বামপন্থীদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ অনেক দিন ধরেই র‍্যাডিক্যাল চিন্তার ও কার্যকলাপের দুর্গ।

যে অধ্যবসায়ের সাথে সিপিআই(এম) নিচুতলার কৃষক, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, এবং তার পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানহীনতার শিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একজোট করেছে, তা ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম দিকে যেভাবে ভূমিসংস্কার ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা দেশের অন্যত্র মডেল হিসাবে কাজ করেছে। পাশাপাশি, রাষ্ট্রটিকে সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের একটি বড় আকারের পুনর্গঠনের জন্য রাজনৈতিক বিভাজন ভেদ করে সফলভাবে জাতীয় স্তরে প্রচার আন্দোলন চালানোর জন্যও তারা বাহবা পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের আধিপত্য চলতে থাকার তত্ত্বকে ঘিরে দেশের কোণে কোণে র‍্যাডিক্যাল স্বপ্ন দেখা চলছিল।

এই সব স্বপ্ন বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন দিকে বামফ্রন্ট সরকার যে সব উদ্যোগ নিচ্ছিলেন সেগুলিকে শুকিয়ে যেতে দেওয়া হলো। বাম রাজত্ব হয়ে উঠলো অবসন্ন এক একঘেয়েমি। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের পরামর্শ নিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি মেনে চলা বন্ধ হলো। মনে হয়, অনেক জেলায় বামফ্রন্টের গ্রামীণ সংস্কারের ফলে আসা স্বাচ্ছল্যের কারণে পার্টি অনুগামীদের শ্রেণী অবস্থান পাল্টে যাওয়ার ফলে এই প্রবণতা আরও জোরালো হলো। গত দশকের ঘটনাবলী বামফ্রন্টের বিপর্যয় ডেকে আনল। সেই বিপর্যয় কতটা ভয়ানক সেটা সম্পূর্ণ বোঝা গেল রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভয়ানক ফল থেকে, যে ফল বামফ্রন্টের ও সিপিআই(এম) পার্টির নেতাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। সিপিআই(এম)-এর, এবং ফলত বামফ্রন্টের, ওপরতলার নেতারা নাকি এখনো এই বিপর্যয়ের কারণ গবেষণা করছেন, বিশ্লেষণ করে দেখছেন। ভালো করার সুযোগ ছাড়তে নেই। এখানে তাই ঐ নেতাদের অবগতির জন্য ঘটনার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হলো, যা সারা পৃথিবীর লোক জানেন, কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁরা জানেন না।

১। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে উপর্যুপরি নির্বাচন জিতে সিপিআই(এম)-এর নেতাদের মাথা ঘুরে যায়, তাঁদের মনে হয় যে তাঁদের পার্টিটি অজেয়, পশ্চিমবঙ্গে তাদের রাজত্ব চিরস্থায়ী। ভয়ানক প্রতিযোগিতামূলক এই বহুদলীয় জমানায় যে ছোটবড়ো যে কোনও ভুলই বিরোধীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে— এই সাধারণ সত্যটিকে অগ্রাহ্য করা হলো।

২। অজেয় হওয়ার এই ধারণাটি মতাদর্শ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঢিলেমি আনলো। জনগণ যেহেতু সর্বদাই তাদের সাথে থাকবেন, পার্টির নেতা ও মন্ত্রীরা তাই ঠিক করলেন নীতি নিয়ে এমন কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন, বামপন্থায় যেগুলোর অনুমোদন নেই। আয় ও কর্মসংস্থানে গতি আনতে দ্রুত শিল্পায়ন করা দরকার। ২০০৬ সালের রাজ্য নির্বাচন বামফ্রন্ট সরকারকে অনুমোদন দিয়েছে শিল্পায়নের কর্মসূচি রূপায়িত করার। পাবলিক সেক্টরে নতুন শিল্প গড়ার হ্যাপা অনেক। আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সম্পদের অভাব আছে। তাহলে এর বদলে অর্থনৈতিক

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

উদারপন্থার বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে বেসরকারি পুঁজি-পতিদেরই বড় আকারে ঢুকতে দিই না কেন? মার্কসীয় তত্ত্ব তো বলছেই যে পুঁজিবাদী বিকাশের পরই বিপ্লব ঘটবে। তো, পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তি পুঁজির সাহায্যে পুঁজিবাদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করি না কেন? বড় শিল্পকে সবুজ সংকেত দিতে ফ্রন্ট সরকার রাজ্যের আয়ের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস বিক্রয়করের জায়গায় আনলেন ভ্যাট বা ভ্যাল্যু অ্যাডেড ট্যাক্স। এতে কর্পোরেট সেক্টর উল্লসিত হলো, অনেকদিন ধরেই তারা চাইছিল বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয় করের বিভিন্ন ব্যবস্থার ঝামেলা উঠে গিয়ে একটি একীভূত জাতীয় বাজার গড়ে উঠক।

৩। মতাদর্শ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বিরাট বদল বামফ্রন্টের শক্তির প্রধান উৎস, তার কৃষক ভিত্তির উপর, বিরাট প্রভাব ফেলে। বড় বড় পুঁজিপতিদের ডাকা হলো শিল্প গড়তে, কিন্তু শিল্প তো হাওয়ার ওপর গড়া যায় না, তাদের জমি দিতে হবে। ব্যক্তিগত পুঁজির পছন্দমতো জমি তাদের পছন্দমতো পরিমাণে অধিগ্রহণ করার আশু প্রয়োজন। বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জনগণের পরামর্শ করার প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়া হলো, পঞ্চায়েত ও কিষান সভাকে এড়িয়ে যাওয়া হলো, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ শুরু হলো। তার পরের কথা তো ইতিহাস, দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস।

৪। জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংবেদনশীল ব্যবহার করার জন্য কোনও নির্দেশ গেল না পুলিশের কাছে। কৃষক ঘরের নিরস্ত্র নারী ও শিশুদের ওপর ঠান্ডা মাথায় গুলি চালালো তারা— বামপন্থী প্রশাসনে এতদিন যা অভাবনীয় ছিল। সব স্তরের মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের মতো। বামফ্রন্টের মন্ত্রী ও রাজ্য স্তরের পার্টি নেতারা এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে নির্লজ্জতার পরিচয় দিলেন তা মানুষকে আরও ক্রুদ্ধ করলো। অনেক দিনের পোড় খাওয়া বাম সমর্থকরাও সরে গেলেন— এখন তো মনে হচ্ছে যেন চিরকালের জন্যই।

৫। অজেয় হওয়ার ধারণা আর একটি মারাত্মক দোষের জন্ম দিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত, এমনকি র‍্যাডিকাল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাঙালিরও, অবচেতনে সামন্তবাদী চিন্তা লুকিয়ে থাকে। তাদের পার্টি সবার ওপরে, আর চিরদিন তা-ই থাকবে, এই দৃঢ় ধারণা জন্ম দিল দাম্ভিকতা ও হামবড়া মনোভাবের, তা থেকে এলো দলবাজি ও মোসাহেবি। সুযোগসন্ধানী সুবিধা পেয়ে গেল। প্রশাসন ও পার্টি যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রবেশ করল দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা। এ পর্যন্ত যাদের সততায় কোনও ভেজাল ছিল না তাদেরও এরা অনেক সময় নিজেদের স্তরে টেনে নামালো। ব্যক্তিপূজার এই দেশে উপরতলায় আত্মম্ভরিতা নিচের স্তরগুলিকেও প্রভাবিত করল। প্রশাসন ও পার্টির সব স্তরে এর প্রভাব পড়লো, পঞ্চায়েতগুলোও বাদ গেল না। গত দশকে পশ্চিমবঙ্গে এটাই ঘটেছে।

দিল্লীর মতো বড় আকারের দুর্নীতি হয়ত ঘটল না, কিন্তু ছোটখাট দুর্নীতি সর্বত্র দেখা দিল। তা ছাড়া, দলবাজি দক্ষতার শত্রু। যেখানে সরকারের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, সেখানে ওপরওয়ালারা চায় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন পদগুলিতেও নিজেদের বিশ্বাসী লোক বসাতে। সংবেদনশীল প্রশাসনিক পদই হোক, বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই হোক, লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দক্ষতা আর প্রধান বিবেচ্য থাকলো না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি প্রভাবশালী অংশ ক্রমশ সরে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ এটি। সব কিছু বাদ দিলেও, অদক্ষতার অর্থ অযোগ্যতা। প্রশাসনের মান দারুন নেমে গেল।

৬। স্বজনপোষণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মিশ্রণ খুব ভয়ানক। কেন্দ্রিকতা গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরে। বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সেটাই বলা হতে থাকল, যা তারা শুনতে চান। প্রতিবাদীদের একঘরে করে দেওয়া হলো, নয়তো বের করে দেওয়া হলো। এই অসুস্থতার একটা ভয়ংকর প্রকাশ দেখা গেল ভোট গণনার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বাম নেতাদের নিজেদের ক্ষমতায় উপর হাস্যকর আস্থার মধ্যে: চিন্তার কিছু নেই, ভালো রকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্টই আবার ক্ষমতায় আসছে।

৭। অহংবোধের আর একটি ফল দেখা দিল। যারাই বন্ধুভাবে সমালোচনা করবেন, মন্ত্রী ও নেতাদের পছন্দ নয় এমন কথা বলবেন, তাদেরই শত্রু মনে করা হতে লাগল। এভাবে বন্ধুদেরও শত্রু বানানো হলো। লোকসভা নির্বাচনের পর এরকম একটি বন্ধুত্বমূলক পরামর্শ ছিল— এই অবস্থায় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভালো করে কাজ করতে পারবে না, যত দিন তারা সরকারে থাকবে তাদের মুখ আরো পুড়বে। এর চেয়ে ভালো হবে বামফ্রন্ট আমলে যেসব ভুল করা হয়েছে সেগুলিকে বিনয়ের সাথে স্বীকার করে নিয়ে জনগণের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করা, সরকার ত্যাগ করে জনগণের মধ্যে গিয়ে কাজ করা। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। তার ফল— দু বছরের ওপর সরকার আঁকড়ে বসে থাকার ফলশ্রুতিতে আরও ২.৫ শতাংশ মানুষ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চলে গেলেন।

৮। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর সিপিআই(এম)-এর রাজ্য নেতৃত্ব শুধু স্বীকার করেছিলেন যে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু দুঃখজনক ভুল হয়েছে। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পার্টি থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সরানোর জন্য একটি 'শুদ্ধিকরণ' অভিযান চালানো হবে। কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু 'শুদ্ধিকরণ' অভিযান করতে গিয়ে যাদের 'শুদ্ধিকরণ' করা দরকার ছিল তারাই এই অভিযানের কর্তা হয়ে বসলেন।

এর পর ১৯ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের ময়দানে নতুন বাম ঐক্য গড়ে তুলতে হবে

অরিন্দম সেন

রাজ্য রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান হল। আজ প্রয়োজন গণরায়ের প্রকৃত তাৎপর্য বা শিক্ষা এবং নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গণসংগ্রামের ময়দানে নীতিনিষ্ঠ বাম ঐক্য গড়ে তোলা। যে প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসে তা হল— এতকাল পরে, এমন কি ২০০৬ সালেও জনমত বিপুলভাবে শাসক ফ্রন্টের পক্ষে যাওয়ার পর, কীভাবে তা এত দ্রুত এত নির্ধারকভাবে সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে ও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ঘুরে গেল? অত্যাচার অপশাসন তো নতুন কিছু নয়। ১৯৭৯ সালেই জ্যোতিবাবুর পুলিশ কলকাতা বন্দরে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে ছয়জনকে হত্যা করেছিল, নন্দীগ্রামের চাইতে বহুগুণ বড় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল মরিচঝাঁপিতে। তারপর থেকে হরেক অপকর্ম বাড়তেই থেকেছে। ফলে পথেঘাটে শাসক দলের নিন্দা বহুবছর ধরে শোনা যাচ্ছে। ২০০১ সালে তো গেল গেলে রব উঠে গিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার সচেতন মানুষ সিপিআই(এম) ও তার সঙ্গীসাথীদেরই ভোট দিয়েছেন বারবার। প্রথম দিকে ইতিবাচক সমর্থন। পরে ক্রমশ চাঁদ সদাগরের মনসা পুজোর মত করে ফুল ছুঁড়ে দেওয়া, যেহেতু তাঁরা জানতেন যে বিকল্প হিসেবে কংগ্রেস বা তার অপভ্রংশ অথবা উভয়ের জোট হবে আরও জঘন্য। ঠিক এই জায়গাটা পাল্টে দিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম। মানুষ যেন সমস্বরে বলে উঠলেন ঢের হয়েছে আর নয়, যে আসে আসুক যা হবার হোক, এই বিশ্বাসঘাতক দাম্ভিক অনুশোচনাহীন অত্যাচারীদের আগে হঠাও। একই ওয়েভলেংথে প্রবাহিত হল রাজ্যবাসীর মন, অভিব্যক্ত হল প্রতিবাদে প্রতিরোধে, আর এটাকে ধরে উঠে এলেন শাসকশ্রেণীর সবচাইতে তৎপর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিধি। সর্বত্র ও সবার আগে নিপীড়িত মানুষের মধ্যে ছুটে গিয়ে, মিছিল মিটিং ধর্ণা অনশন করে, আত্মম্ভরী শাসকদের প্রতি সাহসী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে, এক কথায় বামপন্থার মেজাজটা চুরি করে নিয়ে মমতা ব্যানার্জীই হয়ে উঠলেন বাঙালির সুপ্তোত্থিত পরিবর্তন-আবেগের প্রধান চ্যাম্পিয়ন। ধুরন্ধর সংবাদমাধ্যমও এভাবেই তুলে ধরল তাঁকে। কৃষকের বিরুদ্ধে টাটা-সালিমের পক্ষ নিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারল সিপিআই(এম) আর জমি-জীবিকা গণতন্ত্রের কথা বলে, নির্বাচনী প্রচার পুরনো-নতুন গণসঙ্গীতের উদ্দীপনায় ভরে দিয়ে মসনদ দখল করল তৃণমূল।

এই ঘটনাক্রম দেখিয়ে দেয়, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ— শ্রদ্ধা করতে হয় তাঁদের— এত কাল ধরে বামপন্থার নামে এত বজ্জাতি সয়েও আজও মর্মে মর্মে বামপন্থী (যদিও সিপিআই(এম)-বিরোধী) এবং গণতন্ত্রপ্রিয়। আমরা আশ্বস্ত থাকতে পারি, মহাকরণে পরিবর্তন এলেও মূল জায়গাটা ঠিক আছে, সাচ্চা বামপন্থীদের অনুকূলে আছে। আরও যেটা লক্ষণীয় তা হল সংসদীয় পরিধির বাইরে সাধারণ মানুষের ময়দানী লড়াই আর নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্যেকার সম্পর্ক। সিঙ্গুরের সবুজ ক্ষেত থেকে উঠে আসা গণবিদ্রোহের যে মহাতরঙ্গ নন্দীগ্রামে পৌঁছে পুরোদস্তুর সুনামিতে পরিণত হয়েছিল, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতারও রাজপথ, প্রণোদিত করেছিল রিজওয়ানুর থেকে রেশন দুর্নীতি পর্যন্ত অগণিত ইস্যুতে সুতীব্র সংগ্রাম, মিলে গিয়েছিল জঙ্গলমহলে আদিবাসী বিদ্রোহের সাথে— তারই ধারাবাহিকতায় ও তার প্রতিফলন হিসেবে ঘোষিত হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধানসভা পর্যন্ত রাজ্যবাসীর রায়। মানুষের মহারণকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েই মহাকরণে এসেছে ঘোর জনবিরোধী শক্তি, যে দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই ইতিহাসে। এই আন্তঃসম্পর্ক অস্বীকার করে ভুলভাল জায়গায় পরাজয়ের কারণ খোঁজেন অধঃপতিত 'মার্কসবাদী'-রা আর মার্কস-লেনিনের উত্তরসাধকরা এখানেই দেখতে পান নির্বাচনী ফলাফলের ইতিবাচক পটভূমি ও তাৎপর্য, খুঁজে পান এগিয়ে যাওয়ার পথ ও পাথেয়। তাঁরা অনুভব করেন, সরকারী ও দলীয় সন্ত্রাসের বিপরীতে গণতন্ত্র, ঔদ্ধত্য-অপমানের বিপরীতে মানুষের সম্মান, ফাঁপা বুলি ও পার্টিবাজির বিপরীতে স্বচ্ছ প্রশাসন ও জনমুখী উন্নয়নের যে গণদাবি বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে বাংলার রাজনীতিকে গতি দিয়েছে, তাকে অবলম্বন করেই নতুন স্তরে আন্দোলন গড়ে তোলার বিরাট সুযোগ আসছে তাঁদের সামনে। কারণ নতুন সরকার তো ঠিকমত এগুলো দিতে পারবে না। দিনের শেষে তাকে ইউপিএ সরকারের ধিক্কৃত পথেই চলতে হবে— রাজ্যস্তরে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটতো ইউপিএ জোটেরই মিনিয়েচার সংস্করণ। জাগ্রত জনতা তা মেনে নেবে না, সে কারও কেনা নয়। এখানেই অবকাশ সংগ্রামী বামপন্থীদের, যাঁরা সরকার-নির্ভর নন।

কল্পতরু হতে চাওয়া মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরই প্রতিশ্রুতি-জালে বেঁধে ফেলার সুযোগ ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে, আরও আসবে। তিনি প্রথম দিনেই ঘোষণা করলেন, সিঙ্গুরের "অনিচ্ছুক" কৃষকদের ৪০০ একর জমি ফেরত দেওয়া হবে অবিলম্বে। সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী সংগঠন এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিল— জমিকে বর্তমান অবস্থায় নয়, চাষযোগ্য করে তুলে ফেরত দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে, পাঁচ বছর চাষ বন্ধ থাকার দরুণ যে আয় থেকে বঞ্চিত

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

হয়েছেন জমি-মালিক, বর্গাদার ও কৃষকমজুররা, তাও পুষিয়ে দেওয়া অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার। এছাড়া তথাকথিত 'ইচ্ছুক''দের মধ্যেও অনেকেই চাপের মুখে বা জমিও তার অর্থমূল্য দুটোই হারাবার ভয়ে জমি বিক্রি করেছেন— সুতরাং তাঁদের সকলকে আর একবার নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ বা '''অপশন'' দেওয়া হোক। প্রবল তৃণমূলী উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এ বিবৃতি ইতিবাচক সাড়া পায় এবং সরকার বা অন্য কেউ একে অন্যায় বা অযৌক্তিক বলতে পারে নি। এভাবে ধাপে ধাপে এগোতে পারলে, কে বলতে পারে আগামী দিনে সিঙ্গুর আর একবার ক্ষমতামদমত্তদের গলার ফাঁস হয়ে উঠবে না?

এইসব কেন্দ্রীয় ইস্যুতে সংগ্রাম গড়ার জন্য অবশ্য ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে এবং মানুষকে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সবকিছু বুঝে নেওয়ার সময় দিতে হবে। কিন্তু পঞ্চায়েতী কাজকর্ম, বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে হরেক আশু দাবিতে আন্দোলনের অবকাশ তো সব সময়েই থাকে। এর ইঙ্গিত এমন কি নির্বাচনী ফলাফলেও মিলবে। সকলেই জানেন, পূর্ব মেদিনীপুর তৃণমূলের অন্যতম শক্তিশালী ও আদি ঘাঁটি, বামফ্রন্ট এখানে একটিও আসন পায় নি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের (২০০৯) সাপেক্ষে এই জেলার মোট ১৬টি বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে ১২টিতেই তাদের ভোট কমেছে— কোথাও কোথাও বেশ ভালরকম। খোদ নন্দীগ্রামে কমেছে ১১,৪৫৩ ভোট। এছাড়াও কাঁথি উত্তর, চণ্ডীপুর, রামনগর ক্ষেত্রে ভোট কমেছে যথাক্রমে ১০,৪৫৪; ১৩,৮৩১ এবং ১৪,৮১২। জেলা নেতৃত্ব স্বীকার করেছে, তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েতগুলোর ব্যর্থতাই— বিশেষত ইন্দিরা আবাস যোজনা ও কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে— ভোট কমার জন্য দায়ী। এ দুটো প্রকল্পই গ্রামীণ গরীবের জন্য। স্পষ্টতঃই, জীবন-জীবিকা সমস্যার সুরাহা দেখতে না পেয়ে তাঁরা সরে যাচ্ছেন। এই নীরব প্রতিবাদকে আন্দোলনের ভাষা দেওয়ার দায়িত্ব তো বামপন্থীদেরই। এটা ঠিক যে লক্ষ্মণ শেঠদের মতো শুভেন্দু অধিকারীরাও সহজে সেখানে কাজ করতে দেবেন না। কিন্তু শাসকদের বাধার মুখেই তো ঘটে বামপন্থার বিকাশ, তাই না?

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে আরও কিছু ইতিবাচক দিক চোখে পড়বে। যেসব কমিউনিস্ট বিপ্লবী সংগঠন ও অন্যান্য সংগ্রামী বাম দল স্বাধীনভাবে লড়েছিলেন, খুবই ছোট সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রায় সকলে ভোট বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। সুতীব্র মেরুকরণ এবং ''ভোট নষ্ট করবেন না''— বারংবার মমতার এই আবেদন তা আটকাতে পারে নি, যেখানে সর্বভারতীয় দল বিজেপি-র ভোট কমেছে বিপুল তারকা সমাবেশ সত্ত্বেও। লালগড় আন্দোলনের নেতা ছত্রধর মাহাত লড়েছিলেন জেল থেকে। নিজে প্রচারের সুযোগ পান নি, সংগঠনও ছিল আগোছালো অবস্থায়। তবু, ''সিপিএম তৃণমূল— বিষবৃক্ষের দুই ফুল''— এই চমৎকার শ্লোগান দিয়ে বিশ হাজারের ওপর ভোট পেয়েছেন তিনি।

এইসব ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ঠিক বিপরীতে রয়েছে অত্যন্ত আদর্শবাদী একটি দলের করুণ কাহিনী। বছর কয়েক আগে এঁরা তৃণমূলের বাজার ভাল দেখে হঠাৎই পুরনো বন্ধুদের ব্যথিত করে তৃণমূলের হাত ধরেছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনে মমতার কাছে ১২টি আসন চেয়ে পেলেন মাত্র দুটি (যেখানে তাঁরা বহু বহুকাল ধরে জিতে চলেছে নিজের শক্তিতেই), হারালেন একটি। দ্রুত সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করলেন, মন্ত্রীসভায় যাব না। পরদিন আবার সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে হল কিছুটা দৃষ্টিকটুভাবেই, বলতে হল— জোট থেকেও বেরিয়ে এলাম আমরা। এখন কি তাঁরা ভুল স্বীকার করে বাম ঐক্যের পথে ফিরবেন? সময়ই সে কথা বলবে।

নির্বাচনী রায়ের বিশ্লেষণে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিতে এবার আসা যাক : পার্টি লাইনে কোন গলদের জন্য সিপিআই(এম)-এর দুর্গপতন ঘটল। কেউ কেউ বলছেন, বস্তাপচা কমিউনিস্ট মতাদর্শ এবং ''চলছে না চলবে না'' রাজনীতি অনুসরণ না করে বৃদ্ধবাবুরা যদি উন্নয়নের ও সরকার চালানোর নয়া-উদারবাদী মডেলটি ভালভাবে (যেমন নরেন্দ্র মোদীর মত) কার্যকরী করতেন, তবে তাঁদের এ দশা হত না। শাসকবর্গের এই উপদেশের প্রতিধ্বনি বাম শিবিরের অভ্যন্তরেও শোনা যায়। সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক যেমন বলেছেন, হয় নিজেদের পাল্টে নাও নইলে ধ্বংস হও। কিন্তু ১৯৮০-র দশক থেকে স্থায়ী সরকারের নেশায় বুঁদ হয়ে ঐ দিশাতেই তো লাগাতার নিজেদের পাল্টেছেন তাঁরা। সীমিত ভূমিসংস্কার বন্ধ করে জোতদার/ধনী কৃষকদের বন্ধু হয়েছেন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আরও রাশ টেনে হয়েছেন পুঁজির বন্ধু, দক্ষ মউ-শিকারী রূপে প্রশংসা কুড়িয়েছেন কর্পোরেট কুলপতিদের ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের। ''ব্র্যান্ড বুদ্ধ''-এর আমলে দক্ষিণায়ণ শেষ সীমায় পৌঁছেছে এবং উন্নয়নের এই পথ ও প্রকরণের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ তথা গণ-প্রতিরোধ স্থায়ীত্বের সৌধ ধ্বসিয়ে দিয়েছে। কলকাতা লন্ডন হয়নি কেন— মধ্যবিত্তের এই অভিযোগে নয়, জোতদার-ধনী কৃষক-বুর্জোয়াদের চক্রান্তে নয়, অতীতের মত কমিউনিস্ট কাঁটা সহ্য করতে অপারগ দিল্লী সরকারের আঘাতেও নয়, বুদ্ধ সরকারকে যেতে হয়েছে ব্যাপক গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষের রায়ে। বামপন্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, বিশেষত ভূমিসংস্কারের বিপরীত পথে হেঁটে কৃষকের জমি বন্দুকের জোরে কেড়ে নেওয়ার অপরাধেই তাকে প্রাপ্য দণ্ড দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তাঁদের মনের কথা বুঝেই মমতা ব্যানার্জী নিজের আসল শ্লোগান ''লাল হঠাও'' আপাতত স্থগিত রেখে র‍্যাডিকাল হাবভাব দেখাতে লাগলেন, ''মা মাটি মানুষ''

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

শ্লোগান দিলেন। এবং জয়যুক্ত হলেন।

সরকার পতনের সর্বপ্রধান কারণ সম্পর্কে সিপিআই(এম)-এর ভেতর থেকে সবচাইতে জোরালো ও ধারাবাহিক সমালোচনাটি উঠে এসেছে জনপ্রিয় ভূমিসংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার মুখ থেকে, নিজেকে যিনি "চাষীর ব্যাটা' বলতে গর্ব বোধ করেন। এটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়, অতীতেও ভূমিসংস্কার দপ্তরেরই দায়িত্বপ্রাপ্ত, সকলের শ্রদ্ধাভাজন কৃষক নেতা বিনয় চৌধুরী বামফ্রন্টের ভেতর থেকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম তোপটি দেগেছিলেন। আজকের রেজ্জাকের মত তিনিও সেদিন তিরস্কৃত ও কোণঠাসা হয়েছিলেন। স্পষ্টতঃই সিপিআই(এম)-র শীর্ষ নেতৃত্ব "শুদ্ধিকরণ" বলতে কেবল কর্মীদের ঔদ্ধত্য ও অন্যান্য বাহ্যিক রোগলক্ষণের চিকিৎসাই বোঝেন— মূল রাজনৈতিক ব্যাধি বা পার্টি লাইনের বুনিয়াদী ভ্রান্তি মানতে, এমনকি আলোচনায় আনতে তাঁরা নারাজ। এত বড় আঘাত খেয়েও নতুনভাবে ভাবতে নারাজ।

আর এ কারণেই, ২০১১-র গণরায় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতেও তাঁরা অপরাগ। সুতরাং দলের মতাদর্শগত বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এসেই চিন্তাশীল কমরেডদের ঠিক করতে হবে কীভাবে তাঁরা নতুন পরিস্থিতিতে বামপন্থার পুনর্জাগরণে ভূমিকা নিতে পারেন। একটি উপায় হল স্থানীয় বা রাজ্য স্তরে নতুন সংগঠন গড়ে সমমনোভাবাপন্ন শক্তিগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। পশ্চিমবঙ্গে, কেরলে, পাঞ্জাবে ও অন্যত্র অনেকে এ পথে এগিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকটি সংগঠন "সারা ভারত বাম সমন্বয়" নামে একটি মঞ্চে জোটবদ্ধও হয়েছেন। অন্য পথ হল পুরনো পার্টির ভেতরেই বিতর্ক চালানো ও শক্তি সঞ্চয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সংগ্রামী বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ও সহযোগিতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। যে বিকল্পই বেছে নিন না কেন, সকলকে বুঝতে হবে যে সরকার নির্ভর বাম ঐক্যের দিন শেষ, আজ প্রয়োজন পুরনো সব দ্বিধা ও সংস্কার ত্যাগ করে শ্রেণীসংগ্রামের ময়দানে নতুন চরিত্রের ব্যাপক বাম ঐক্য গড়ে তোলা।

নিছক তৃণমূলী আক্রমণের মুখে নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য নয়, ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী ঐতিহ্য ও হৃত গৌরব পুররুদ্ধারের লক্ষ্যেই বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দলের সৎ ও সচেতন কর্মীবৃন্দকে আজ এগিয়ে আসতে হবে। মাওবাদীরা যদি তাঁদের 'বাম' সুবিধাবাদ ও সঙ্কীর্ণতাবাদ ত্যাগ করে গণ আন্দোলনের ময়দানে বাম ঐক্যে সামিল হতে চান তবে তাঁরাও স্বাগত। এভাবেই সম্মিলিত শক্তিতে আমরা পারব শাসক দলগুলোর ও বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের প্রচার মিথ্যা প্রমাণ করতে, সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে যে, ভারতবর্ষে বামপন্থা কোন সংকটে পড়ে নি। বরং শ্রেণী সমঝোতাবাদী সমাজ-গণতন্ত্রী সরকারের অনিবার্য পতনের ফলে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ আগামী দিনে ত্বরান্বিত হতে চলেছে, বহু বছরের ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে বাম আন্দোলন নবজীবন লাভ করতে চলেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বাংলা তথা ভারতের সাচা বামপন্থীরা প্রস্তুত।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট কী ভুল করেছে

১৭ পৃষ্ঠার পর

৯। ভারতের যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি আছে বলা হয় তাকে রক্ষা ও সুদৃঢ় করায় বামপন্থীদের দৃঢ় আস্থা। অতীতে তারা কেন্দ্রের পুলিশ বাহিনী বাড়ানোর সমস্ত প্রস্তাবকে কঠোরভাবে বিরোধিতা করতেন, কারণ আইনশৃঙ্খলা হলো রাজ্যের বিষয়। ৪০ বছর আগে এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ (সিআরপি) আনার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে জোরদার আন্দোলন হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ছিল তার সামনের সারিতে। একেবারে ডিগবাজি খেয়ে গত দু বছর তথাকথিত মাওবাদীদের দমন করার জন্য আরো কেন্দ্রীয় পুলিশের জন্য জোর দরবার করছেন ফ্রন্ট সরকার। মাওবাদী নামে আখ্যাত এই খুনেদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু এরকম কারণেও নয়াদিল্লীর পশ্চাৎমুখী শাসকদের সঙ্গে জোট বাধা ভয়ানক ভুল হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাড়াবাড়ির ফলে উপদ্রুত এলাকার বিরাট সংখ্যক আদিবাসী মানুষ মনস্থির করে নেন। যে দলটি সিআরপি এনেছে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেন তাঁরা।

১০। বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারও ছিল অগোছালো। রাজনৈতিক নানা বিষয়ের বদল তাঁরা জোর দিলেন ব্যক্তির ওপর। প্রচারকারীদের গলায় ভিন্ন ভিন্ন সুর শোনা গেল। একজন তো এমনকি ছোট জোতও জোর করে অধিগ্রহণের কথা বলে গেলেন। অনেকেই তাঁদের এই দৃঢ় ধারণা লুকাতে পারেন নি যে ২০০৮ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ না ঘটলে সবকিছু ঠিকই চলতো।

অর্থনৈতিক উদারনীতির নামে যে লুঠ চলছে তার বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়চিত্ত, মতাদর্শগতভাবে সঠিক বামপন্থী জোট গড়ার গুরুত্ব কমায় না পশ্চিমবঙ্গের এই বিপর্যয়। পশ্চিমবঙ্গের যতই সমস্যা থাকুক এই রাজ্য সব সময় নতুন বাম আন্দোলন শুরু করার উর্বর জমি থেকে যাবে। কিন্তু সেখানকার জনগণ একটি বার্তা দিলেন। কয়েকটি মুখকে, রাজ্যের বর্তমান পার্টি নেতাদের, তারা তীব্রভাবে অপছন্দ করছেন। অন্য দোষ বাদ দিলেও, নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত পার্টি কর্মী ও সমর্থকরা যে এই বিপদে পড়েছেন তার জন্য ওরাই দায়ী। ওদের দিয়ে চলবে না।

সরাসরি সত্যি কথা বলার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। একসময় কি আমরা বলতাম না, 'কমরেড, একে আমরা আত্ম-সমালোচনা বলি'?

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বামফ্রন্ট পরাজিত : বামপন্থার ভবিষ্যৎ কী?

পার্থ সারথি

বামফ্রন্টের পরাজয়, বামপন্থার নয়

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয় শুধু বামফ্রন্ট-ভুক্ত দলগুলোকে চিন্তায় ফেলেছে তাই নয়, বামফ্রন্ট বিরোধী অনেক বামপন্থীদের কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, তৃণমূল কংগ্রেস জোট যে বিশাল গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তাতে এই রাজ্যে বামপন্থার ভবিষ্যত কী দাঁড়াবে? বামপন্থার অবশেষ কিছু থাকবে তো? প্রশ্নটা এভাবে তুললে মনে হবে এতদিন বুঝি পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার স্বর্গরাজ্য বিরাজ করছিল, হঠাৎ কোথা থেকে অশুভ শক্তি এসে সেই স্বর্গ তছনছ করে বামপন্থার দুর্দিন ডেকে এনেছে। এভাবে বললে বামফ্রন্ট তথা তার প্রধান সিপিএম যে কথাটা বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না, সেটাই বলা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, সিপিএম এই কথাটা বলতে পারছে না কেন? কারণ সিপিএম তথা বামফ্রন্টের পরাজয় যে বামপন্থার পরাজয় নয়, বিপরীতে বামপন্থী নীতিমালা থেকে চূড়ান্তভাবে ভ্রষ্ট অধঃপতিত একটা দল বা জোটের পরাজয়, এটা এই নির্বাচনে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরই ফলে সম্ভবত, সিপিএম দলের রাজ্য দফতরে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাবার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেসব নেতারা নির্বাচনের ফল বেরোবার আগের রাতেও সাংবাদিকদের রীতিমত ধমক দিয়ে বলছে, মিডিয়া নাকি তাদের হারাবার জন্য মিথ্যা প্রচারে নেমেছে, রাজ্যে 'মিডিয়া সন্ত্রাস' চলছে ইত্যাদি, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তারা একরকম চুপ মেরে গেছেন। আকারে এবং অন্তর্বস্তুতে দানবীয় হয়ে ওঠা বামফ্রন্ট সরকারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্যও বুঝি লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিই ঘোর সংকট, তবে সেটা বামফ্রন্টের, বামপন্থার ধর্ষণকারী এক রাজনৈতিক জোটের, কখনই বামপন্থার নয়। যদিও এটা ঘটনা যে, চারিদিকে এখন লাল পতাকা নামিয়ে তেরঙ্গা পতাকা ওড়ানোর ধুম লেগেছে।

তবু তর্ক উঠবে, হাজার হোক একটা দক্ষিণপন্থী জোট ক্ষমতায় এলো, এটা তো পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একটা বিপজ্জনক ব্যাপার বলে স্বীকার করতে হবে। এভাবে দেখার সমস্যা হল, এক্ষেত্রেও মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, এতদিন একটা বামপন্থী শক্তি ক্ষমতায় ছিল, দক্ষিণপন্থী আচরণ করলেও বামফ্রন্ট আসলে বামপন্থীই ছিল। এই ভাবনা থেকেই এত কিছুর পরেও বেশ কিছু মানুষ এখনো বামফ্রন্টকেই সমর্থন করেন। বামপন্থার মোড়কে দক্ষিণপন্থার চোলাই বিতরণ যে দক্ষিণপন্থার থেকেও বেশি বিপজ্জনক (ছদ্ম শত্রু বা গুপ্ত ঘাতক যেমন বরাবরই বেশি বিপজ্জনক), সেই রাজনৈতিক বোধ না থাকার ফলেই এমন বিভ্রান্তির জন্ম হয়। এমন বিভ্রান্তির ফলেই বহু মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়ার আগের দিন পর্যন্ত ওই দেশটাকে সমাজতান্ত্রিক বলে মনে করতেন, আর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে সাম্যবাদী দল বলে ভাবতেন। ইতিহাসের উপর্যুপরি নির্মম কশাঘাত এতদিনেও যাদের সম্বিত ফেরাতে পারেনি, বামফ্রন্টের বিপুল পরাজয়ে তারা শোকগ্রস্ত হবেন এ আর আশ্চর্য কী! পাশাপাশি বামপন্থা-দক্ষিণপন্থার নিরিখে এবারের নির্বাচনকে বিচার করলে এক কথায় বলতে হয় এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নামক অ-বামপন্থী দলটি বামপন্থী ভাবমূর্তি ধারণ করে দক্ষিণপন্থার অনুসারী বামফ্রন্টকে ধরাশায়ী করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ বিরোধী নেত্রীর মোহময়ী ব্যক্তিত্বে মোহগ্রস্থ হয়ে বামফ্রন্টকে ত্যাগ করেছেন, এমনটা নিশ্চয় কেউ বলবেন না। ইতিহাস বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধায় ২০০১ সাল থেকে বামফ্রন্টের 'মৃত্যু ঘণ্টা' বাজিয়ে চললেও ইপ্সিত সাফল্য পেতে তাঁকে দীর্ঘ ১০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সাফল্য পাওয়ার জন্য তাঁকে নিজেকে রূপান্তর ঘটাতে হয়েছে, বামপন্থার কর্মকৌশল আত্মস্থ করে বাংলার মাটিতে তা প্রয়োগ করতে হয়েছে। তৃণমূল দলের অতি-বড়ো নিন্দুকও বোধহয় স্বীকার করবেন, এবারের নির্বাচনে এই দলের অসামান্য সাফল্যলাভের পেছনে প্রধানত কাজ করেছে ২০০৬ সাল থেকে শুরু হওয়া কৃষিজমি রক্ষার জন্য একের পর এক কৃষক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে তৃণমূল দল এবং তার নেত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

ঘটনা এটাই যে, পশ্চিমবঙ্গের মরা গাঙে বহু-প্রতীক্ষিত বহু-আকাঙ্খিত গণ-আন্দোলনের জোয়ার যখন কৃষক আন্দোলন রূপে আবির্ভূত হলো, তখন তাকে আবাহন জানানোর জন্য কোনো বামপন্থী দল বা নেতৃত্ব প্রস্তুত ছিলো না। সিঙ্গুর এবং পরবর্তীকালে নন্দীগ্রামে সেই ঐতিহাসিক কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনে কৃষকদের পক্ষে প্রধান সহযোগী শক্তি হিসাবে দাঁড়ালো তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের নেত্রী। নন্দীগ্রামে সিপিএম-এর হার্মাদ বাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযান এবং তাদের ভয়াবহ অত্যাচার প্রতিরোধেও মুখ্য ভূমিকা নিল এই দলটিই। কিছু বামপন্থী দল ও ব্যক্তি সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনে যোগ দিলেও তাদের ভূমিকা ছিল নিতান্তই প্রান্তিক। লক্ষণীয় বিষয় হল, মাওবাদীসহ যেসব বামপন্থী শক্তি এই আন্দোলনগুলোতে যুক্ত হয়েছিল তাদের কিন্তু আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনেই যুক্ত হতে হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে আন্দোলনের গুরুত্ব ধরতে না পারার ফলে কার্যত লগ্ন

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পেরিয়ে যাওয়ার পর আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় এছাড়া তাদের কিছু করারও ছিল না। সব মিলিয়ে তৃণমূল ও তার নেত্রী এ রাজ্যে বামপন্থীদের থেকেও বেশি বামপন্থী, এমন একটা ভাবমূর্তির নির্মাণ সে সময়েই সম্পন্ন হয়েছিল।

সুতরাং ২০১১ সালের নির্বাচনে যখন তৃণমূল দল এই বামপন্থী ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে মানুষের সমর্থন ভিক্ষা করলো, তাকে খণ্ডন করার মত কোন যুক্তি কোনো বাম দলের অস্ত্রাগারে ছিল না। নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন, এবারের নির্বাচন হচ্ছে মেকি বামপন্থার সাথে প্রকৃত বামপন্থার লড়াই। রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের কাছে যে একথা একটা পরিমাণ বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছিল, নির্বাচনী ফলাফলে তারই প্রতিফলন হয়েছে। অর্থাৎ কৃষক আন্দোলন-জাত বামপন্থী ভাবমূর্তিকে হাতিয়ার করেই তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যের নিপীড়িত কৃষক সমাজের কাছে বামফ্রন্টের বিকল্প হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো। কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস ধনিক শ্রেণীর দল, জোতদারদের দল, আর বামফ্রন্ট নিপীড়িত গরিব মানুষের প্রতিনিধি, শাসক বাম দলগুলোর এই চিরাচরিত প্রচার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম মিথ্যা বলে প্রমাণিত করলো। এই নির্বাচনে রাজ্যের নিপীড়িত কৃষক-সমাজের কাছে বামফ্রন্ট ছিল আগ্রাসী পুঁজিবাদের পক্ষে নিপীড়ক রাজশক্তির প্রতীক আর তৃণমূল কংগ্রেস কৃষক স্বার্থবাহী এক সংগ্রামী শক্তির প্রতীক।

কর্পোরেট পুঁজির প্রধান রক্ষক তথা সেবক কেন্দ্রীয় সরকারে এই দলের অংশগ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি রূপায়ণে এই দলের দায় নিয়ে বিভিন্ন বামপন্থী দল যে প্রচার করেছে, তা মানুষের মধ্যে সামান্যই দাগ কেটেছে। কারণ এদেশে ঐতিহাসিকভাবে গণ-সংগ্রামগুলো রাজ্যস্তরেই বিকশিত হয়, আর এই স্তরে এই সময়ে গণ-সংগ্রামের বর্শামুখ ছিল বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে। ফলত, এই নির্বাচনে বামফ্রন্টের অপশাসনের অবসান তথা 'পরিবর্তন' একটি জনপ্রিয় শ্লোগানে পরিণত হয়, আর সরকার-বিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র হিসাবে তৃণমূল দল বামফ্রন্টকে বামপন্থার হাতিয়ার দিয়েই পরাস্ত করে। বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-এর শ্বাসরোধকারী আধিপত্যে অবদমিত এ রাজ্যের বিশেষত গ্রাম-বাংলার এক বৃহৎ অংশের মানুষের কাছে এই নির্বাচনী লড়াই হয়ে উঠেছিল গণতন্ত্রের জন্য প্রায় আরেকটা স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯৭৭ সালের পর আরো একবার প্রমাণ হল, এদেশে চালু সংসদীয় নির্বাচন বিশেষ বিশেষ সময়ে একটা পরিমাণে গণতন্ত্র তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে কাজে লাগতে পারে। এই নির্বাচনে মানুষ শুধু নেতিবাচক ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে পরাস্ত করতেই চায়নি, চেয়েছে গত পাঁচ বছরে আন্দোলনের সুফল রক্ষা করতে আর অধিকারের সীমানা বিস্তৃত করতে (সিঙ্গুরের অধিগৃহীত জমি ফেরত নিয়ে)। ফলে এই নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয় মানে বামপন্থার পরাজয়, একথা কিছুতেই বলা যাবে না।

বামফ্রন্টের ভবিষ্যৎ

এক্ষণে বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম) দলটিকে ধরে যারা বামপন্থার পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবছেন, তাদের সামনে ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার বলেই মনে হবে। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, বহু এলাকায় (প্রধানত গ্রামাঞ্চলে) বামফ্রন্টের প্রবল পরাক্রান্ত প্রধান দলটির অফিস খোলার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বিপরীতে যেসব এলাকায় এই সেদিনও সিপিআই(এম) দলের একাধিপত্য ছিল প্রায় নিশ্ছিদ্র, সেখানে এখন এই দলের অফিস, নেতাদের বাড়ি বা তার আশপাশ থেকে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলছে। সদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসক দলের সমর্থকরা বহু ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে মহা-উৎসাহে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে নেমে পড়েছেন। সিপিএমের যেসব সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা এলাকায় আছেন (বেশিরভাগ বড়ো নেতারা নিজেরাই ভয়ে ঘর ছাড়া হয়েছেন) তারা এই অস্ত্র উদ্ধারে সহযোগিতা করছেন। সিপিএম নেতৃত্ব এটাকে অস্ত্র-উদ্ধারের নাটক বলে অভিহিত করলেও, কোনও দল তার নিজস্ব অস্ত্র-ভাণ্ডার উজাড় করে এত অস্ত্র পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে, একথা বিশ্বাসযোগ্যতা পাচ্ছে না। আর এখন তো নর-কঙ্কাল উদ্ধার পর্ব শুরু হয়েছে, এগুলো নিশ্চয় অন্য দলের কাজ বলে চালানো যাবে না।

নন্দীগ্রাম থেকে নেতাই-এ সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীর (যা হার্মাদ নামে রাজ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে) কাণ্ড-কারখানা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর এখন রাজ্যের মানুষ হতবাক হয়ে দেখছেন, রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে প্রাক্তন শাসক দলটি রীতিমতো অস্ত্র-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল। একদিকে গণতন্ত্রের নামে শপথ নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধুভাণ্ডটি উজাড় করে পান করা, অন্যদিকে বেআইনি অস্ত্র-শস্ত্র মজুত করে খুন-সন্ত্রাসের কাজ চালিয়ে বিরোধী পক্ষকে দমন করা, বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষকে অবদমিত করে রাখা, এই দ্বিচারিতার রাজনীতি যত দিন যাচ্ছে রাজ্যবাসীর কাছে তত উন্মোচিত হচ্ছে। শহরের নিরাপদ আস্তানায় বসে যারা এতদিন বামফ্রন্ট-লালিত গণতন্ত্রে মুগ্ধ ছিলেন, গ্রাম-বাংলায় বুদ্ধদেবের 'উন্নততর' বামফ্রন্টের গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ নিয়ে তাদেরও নতুন করে ভাবার সুযোগ এনে দিয়েছে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি।

স্বাভাবিকভাবেই বামপন্থার দুর্গ বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে এতদিন ক্ষমতায় থাকা সংসদীয় 'বাম' দলগুলো এই মুহূর্তে নিদারুণ সংকটে। তারা শুধু ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তাই নয়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের অস্তিত্ব অনেকাংশে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রথমত, এই অস্ত্র-সম্ভার কোথা থেকে এলো এবং কী উদ্দেশ্যে কোথায় কোথায় এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, তার তদন্ত

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

শুরু হলে সিপিএম দলের অনেক বড়ো বড়ো চাঁই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। গড়বেতায় ছোট আঙারিয়া গ্রামের হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়া যে নেতাদের জেল থেকে মুক্তির পর গলায় মালা দিয়ে 'দলের সম্পদ' বলে বীরের মতো বরণ করে নিয়েছিল এই পার্টি, নতুন করে বিচার শুরু হলে তাদের জেলে যাওয়া আবার প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এই হত্যাকাণ্ডে যে সমস্ত সাক্ষীরা পার্টির ভয়ে আদালতে ওই নেতাদের বিরুদ্ধে নিজেদের বয়ান পাল্টে ফেলেছিল, তারা এখন নির্ভয়ে সাক্ষী দিতে রাজি, ফলে তপন ঘোষ, শুকুর আলিদের যাবজ্জীবন কারাবাস প্রায় নিশ্চিত। এমনই বহু নারকীয় কাণ্ডের নায়ক, যারা একদিন শাসক পার্টিতে থাকার সুবাদে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর পার্টি অফিসে বসে তালিকা তৈরি করে বিরোধীদের খুন করেছেন, জেলে পাঠিয়েছেন, ঘর-ছাড়া করেছেন, হাত-পা ভেঙ্গে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন, নন্দীগ্রামে হার্মাদ পাঠিয়ে যারা গণ-হত্যা আর গণ-ধর্ষণের কালো অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন, লক্ষ মানুষের শান্তির জীবন যারা ভেঙ্গে-গুঁড়িয়ে-জ্বালিয়ে তছনছ করে দিয়েছেন, তাদের নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের দিন শেষ হয়েছে। তপন-শুকুরের মতো এইসব নেতাদের বেশিরভাগ এখন জনরোষের ভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন।

নতুন সরকারের কাছে নন্দীগ্রামের মানুষ বিচার চাইছেন, তাদের ওপর ঘৃণ্য অপরাধের নায়কদের শাস্তি চাইছেন। একইভাবে ৩৪ বছর যাবৎ চলে আসা নানান অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের বিচার চাইছেন গ্রামবাংলার হাজার-লক্ষ নির্যাতিত মানুষ। লক্ষণীয় বিষয় হলো, নতুন সরকার ক্ষমতায় বসেই সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়া নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও নন্দীগ্রামে গণহত্যা ও গণ-ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তি-বিধান করার জন্য কোন পদক্ষেপ এখনো নেয়নি। নন্দীগ্রামের মানুষ এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দাবি যদি হয় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর চাপানো সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, তাহলে অন্য গণ-দাবিটি হলো বিভিন্ন গণ-হত্যা, গণ-ধর্ষণ, গণ-অত্যাচার কাণ্ডের তদন্ত করা এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া। দ্বিতীয় গণ-দাবিটি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে সিপিএম দলটির বিভিন্ন স্তরের বহু নেতার জেলে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে। সিঙ্গুরের প্রতিবাদী তরুণী তাপসী মালিকের ঘৃণিত হত্যাকাণ্ডে যেমন সিপিএমের সিঙ্গুর জোনাল কমিটির নেতা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, তেমনি আরো নানান নারকীয় ঘটনার নায়ক হিসাবে এই পার্টির বড়ো বড়ো বহু নেতার নাম উদঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এমনকি আইন আদালত মারফত শাস্তিবিধান না বলেও সাধারণ মানুষের কাছে বিগত শাসকদের অত্যাচারী রূপটা যে ক্রমেই উন্মোচিত হয়েছে, তা নির্বাচনী ফলাফল থেকেই পরিষ্কার। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এই প্রাক্তন শাসকদের স্বরূপ যদি আরো উন্মোচিত হয় (যেমনটা অস্ত্র-উদ্ধারের ফলে হচ্ছে), তাদের অত্যাচারের তালিকায় যদি আরো নতুন নতুন কাহিনী যুক্ত হয় (কঙ্কাল-উদ্ধারের তদন্ত হলে যা প্রায় অনিবার্য), তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা কোন্ তলানিতে গিয়ে ঠেকবে তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। এসবের ফলে বামফ্রন্টের শিবির ত্যাগের যে প্রবাহ বিশেষত নিম্ন-বর্গের মানুষের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে ক্রমবর্ধমান হারে দেখা গেছে, নির্বাচন পরবর্তী অস্ত্র-উদ্ধার পর্বে যা স্রোতের আকার নিয়েছে, আগামী দিনগুলোতে সেই স্রোত আরো প্রবল হয়ে বামফ্রন্টের পায়ের তলার মাটি যে উত্তরোত্তর ধ্বসিয়ে নেবে, সে বিষয়ে খুব সন্দেহ নেই।

ফলে সিপিএম দলের অতি বড়ো সমর্থকও এই দলটির ঘুরে দাঁড়ানোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশান্বিত হতে পারছেন না। নির্বাচনের আগে দলের নেতাদের কথায় বিশ্বাস করে যারা ভেবেছিলেন যে লোকসভা নির্বাচনের পর 'ঘুরে দাঁড়ানোর' প্রক্রিয়াতে দল তার হৃত জমি অনেকটাই উদ্ধার করে ফেলেছে, তারা এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছেন, দলের নেতারা কেমন গণ-বিচ্ছিন্ন মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। এই নেতাদের হাত ধরেই পার্টি আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে, ক্ষমতায় না হোক আন্দোলনের ময়দানে জনতার মাঝখানে ফিরে আসতে পারবে, এমন আশাও এই মুহূর্তে দুরাশা বলেই মনে হয়। এতবড়ো একটা দল, এই সেদিনও যার দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত, যার লোকাল কমিটি অফিসগুলো কার্যত জমিদারদের কাছারি বাড়ির মতো অঘোষিত বিচারালয়ে পরিণত হয়েছিল, যে কোনো সামাজিক এমনকি পারিবারিক বিবাদে যে দলের নেতাদের কথাই ছিল শেষ কথা, সেই দলটি নির্বাচন পরবর্তী এই ক'দিনে যেন ফাটানো বেলুনের মতো চুপসে গেছে। আর বাম ঐক্যের দোহাই দিয়ে বামফ্রন্টের ছোট শরিক যে দলগুলো সিপিএমের সাথে লেপ্টে থেকে এতদিন ক্ষমতার মধুভাণ্ডে ভাগ বসিয়েছে, তারা এখন সিপিএমের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেরা দায়-মুক্ত হতে চাইলেও জনগণের মধ্যে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে আসবে, এমন ভরসার খুব জায়গা নেই।

স্বাভাবিকভাবেই যারা সিপিএম দলের এতদিনকার বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতায় বিমুগ্ধ হয়ে এই দলটাকে ঘিরে (এই দলটার ভুল-ভ্রান্তি ঘষে-মেঝে সংশোধন করে) বামপন্থার পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখে এসেছেন, দলের নেতাদের মতন তারাও এই মুহূর্তে তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক সংকটের অথৈ সমুদ্রে। এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা যে, একটা বামপন্থী দল, নির্বাচনে হারা-জেতার সাথে যার অস্তিত্ব-রক্ষার প্রশ্ন জড়িয়ে, সেই দলের নেতারা এক মাস হয়ে গেল এতবড়ো নির্বাচনী

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বিপর্যয়ের কোনো ব্যাখ্যা হাজির করতে পারলেন না। এই প্রথম বলা যায়, মোটামুটি একটা ভয়মুক্ত পরিবেশে রাজ্যের ভোটদাতারা বিপুল সংখ্যায় (মোট ভোটারের প্রায় ৮৫ শতাংশ) নির্বাচনে ভোট দিলেন, এবং এই বিপুল ভোটের প্রায় ৫৯ শতাংশ গেল ক্ষমতাসীন বামেদের বিরুদ্ধে। প্রদত্ত ভোটের ৪১ শতাংশ তথা মোট ভোটারের ৩৫ শতাংশ সমর্থক এবার বামফ্রন্টের পক্ষে গেছে এবং 'এখনো ৪১ শতাংশ মানুষ আমাদের পক্ষে আছেন' বলে বামফ্রন্ট নেতারা পরাজয়ের মাত্রাকে ছোট করে দেখাতে চাইছেন। এই নেতারা ভুলে গেছেন যে, যখন 'আমরা ২৩৫ আর ওরা তো মাত্র ৩৫' বলে বুদ্ধবাবু বিরোধীদের প্রতি অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, সেই ২০০৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূল ও কংগ্রেসের মিলিত ভোট ছিল প্রদত্ত ভোটের ৪১ শতাংশের কিছু বেশিই। আমরা আগেই দেখেছি, প্রতিটি নির্বাচনেই আসলে সংখ্যালঘু মানুষের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো। ২০০৬ সালে ভোট পড়েছিল ৮১.৪৯ শতাংশ আর সেই ভোটের ৪৯.৭ শতাংশ অর্থাৎ মোট ভোটারের ৪০.৫ শতাংশের সমর্থন পেয়ে ফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল, আর এবারের ভোটে তৃণমূল জোট প্রদত্ত ভোটের ৪৯ শতাংশ তথা মোট ভোটারের ৪১.৬৫ শতাংশের সমর্থন পেয়েছে। এদেশের সংসদীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের অনুপাত দিয়ে আসলে জন-সমর্থনের মাত্রা বোঝা যায় না। ঘটনা হচ্ছে, ২০০৬ সালের নির্বাচনের পর প্রধান বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, আর এই নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে প্রধান বিরোধী দলের ভিতে বড়ো ধরনের ধ্বস নেমেছে। ফলে বামফ্রন্টের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা অন্তত এই মুহূর্তে অত্যন্ত ক্ষীণ বলেই মনে হচ্ছে।

বামফ্রন্ট-বহির্ভূত বাম শক্তির অবস্থা

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় বামফ্রন্ট বর্হিভূত বামপন্থীদের নানান দল এবং গোষ্ঠীও যে খুব ভালো অবস্থায় আছে তা বোধহয় বলা যায় না। যদিও সিপিএম বা বামফ্রন্ট-এর দলগুলোর মত তারা নির্বাচনী বিপর্যয়জনিত সংকটে নিমজ্জিত নয়, কিন্তু তাদের অবস্থা বলা যায় আরো সুদীর্ঘ এবং প্রায় স্থায়ী এক সংকটের। দীর্ঘ বামফ্রন্ট জমানায় সরকার এবং শাসক দলের বিরুদ্ধে এমন কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, যাতে মানুষের নজর এইসব দলের দিকে আকৃষ্ট হয়, যাতে মানুষ এই তৃতীয় শিবিরের কর্মধারায় শাসক এবং সংসদীয় বিরোধীদের বিকল্প শক্তির সন্ধান খুঁজে পান। সারা পৃথিবী জুড়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে যেমন হয়ে থাকে তেমনি এ রাজ্যের রাজনীতিও প্রধান শাসক দল ও প্রধান বিরোধী দলকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এই আবর্তকে ভেঙ্গে কীভাবে রাজনীতির আঙিনায় নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়, এটা সর্বত্রই সংগ্রামী বামপন্থী শক্তির কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে থেকেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৬০-এর দশকের শেষ-অর্ধে গণ-আন্দোলনের সাথে সংসদীয় রাজনীতির সফল সমন্বয় সাধন করেই বাম দলগুলো রাজ্য-রাজনীতিতে কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। ১৯৭৭ সালে তারই ফলশ্রুতিতে তারা নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘ ৩৪ বছর শাসক হিসাবে এই রাজ্য শাসন করে। সংসদীয় বিরোধী পক্ষ থেকে শাসক হিসেবে তাদের এই বিবর্তনে বামপন্থার আদর্শগুলোকে যে বিসর্জন দিতে হয় তা বলাই বাহুল্য। লক্ষণীয় বিষয় হল, গত পাঁচ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী দল থেকে প্রধান শাসক দলে পরিণত হওয়ার সূত্রটাও একইরকম— গণ-আন্দোলনের সাথে সংসদীয় রাজনীতির সফল সমন্বয়-সাধন। এখানে বামফ্রন্ট বহির্ভূত বাম ও বিপ্লবী শক্তির কাছে প্রশ্ন হলো, রাজ্য-রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে হলে এই সূত্র অনুসরণ করা ছাড়া অন্য পথ খোলা আছে কিনা? আবার এই সূত্র অনুসরণ করলে এই ব্যবস্থায় ক্ষমতায় যাওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে বাম মতাদর্শ থেকে অধঃপতনের যে ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে তাকেই বা কিভাবে এড়ানো যাবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তাত্ত্বিক-মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে খুঁজে বের করে আনা ছাড়া তৃতীয় শিবিরের সংকট কাটবে বলে মনে হয় না। কিন্তু গণ-আন্দোলনের ময়দানেও এই শিবিরের সাফল্য এতো কম কেন?

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে একটা বিষয় পরিস্কার যে, গণ-আন্দোলনের সমর্থন ছাড়া এরাজ্যে কোনো রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা পাওয়ার খুব সম্ভাবনা নেই। সাথে সাথে এটাও দেখা গেছে যে, গণ-আন্দোলন যদি কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারে বা অন্তত পৌঁছনোর আকাঙ্খা জনমানসে জাগিয়ে রাখা না যায়, তাহলে আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থা থাকে না। এ রাজ্যে বামফ্রন্ট-বহির্ভূত বাম ও বিপ্লবী শক্তি গত ৩৪ বছরে নানান গণ-আন্দোলনে যুক্ত হলেও আন্দোলনের সফল পরিণতি লাভে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। ফলে কিছু এলাকায় বা কারখানায় আন্দোলন চলাকালীন তাদের প্রতি প্রাথমিক স্তরে মানুষের সমর্থন গড়ে উঠলেও তা স্থায়ী হয়নি, বা বিস্তৃতি লাভ করেনি। বস্তুত, বিগত জমানায় সিপিএমের সুকৌশলী-সুনিপুণ সাংগঠনিক-প্রশাসনিক আক্রমণ মোকাবিলা করে আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কর্ম ছিলো না এবং তার উপযোগী কর্ম-পদ্ধতি বিকাশ করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে বলেও মনে হয় না।

লক্ষণীয় হলো, বামফ্রন্ট আমলে প্রধানত গণতন্ত্র-হীনতার কারণেই ছোট ছোট বাম দলগুলোর বিকাশ ব্যাহত হয়েছে বলে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

মনে হয়। অথচ গণতন্ত্রের প্রশ্ন নিয়ে প্রধান বিরোধী দল বা তার নেত্রী যে উদ্যোগ এবং অধ্যবসায় নিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার এবং আন্দোলন চালিয়ে গেছে, তার কানাকড়িও কিন্তু তৃতীয় শিবিরের দলগুলোর মধ্যে দেখা যায়নি। মূলত গণতন্ত্রের প্রশ্নেই কিন্তু তৃণমূল নেত্রী সারা রাজ্য জুড়ে মানুষের সমর্থন তার দলের পক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে সিপিএমের দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিটি রাজ্যের ব্যাপক শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে সাধারণ দাবি হিসেবে উঠে এসেছে। অথচ তৃতীয় শিবিরের পক্ষ থেকে এই রাজনৈতিক দাবিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এই প্রশ্নে রাজ্যবাসীর নজরে পড়ার মতো কোন কর্মসূচি নেওয়া হয় নি।

পরিশেষে, বিগত নির্বাচনে যখন এই প্রশ্নটা প্রধান ইস্যু হিসাবে উঠে এলো, এবং বিরোধী নেত্রী দলতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিটিকে ‘পরিবর্তন চাই’ বলে শ্লোগানে রূপান্তরিত করলেন, তখন তৃতীয় শিবিরের দিশেহারা ছবিটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যেহেতু তারা নিজেরা বামফ্রন্টের দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি, তাই পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়ালে তা তৃণমূল দলের পক্ষে যাবে, এই আশঙ্কায় তারা এই জনপ্রিয় শ্লোগান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দলীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে প্রয়াসী হলেন। ফলে এই নির্বাচনে বামফ্রন্টকে পরাস্ত করার মাধ্যমে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ে গণহত্যা-গণধর্ষণের নায়কদের শাস্তি দেবার যে গণ-দাবি উঠে এসেছিল, সিপিএমের দলতন্ত্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার যে গণ-উদ্যোগ গণ-চেতনা দ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, কারখানা থেকে বস্তিতে বস্তিতে ছড়িয়ে পড়ছিল, তা থেকে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন। এই বামফ্রন্ট-বিরোধী হাওয়ার মধ্যেও তৃতীয় শিবিরের দলগুলি যেসব কেন্দ্রে প্রার্থী দিলেন, কোথাও তারা দু-তিন হাজারের বেশি ভোট পেলেন না। রাজ্য-রাজনীতিতে তারা প্রান্তিকই রয়ে গেলেন।

এমনকি যে মাওবাদীরা প্রচলিত ব্যবস্থায় নির্বাচনকে কোনো গুরুত্ব দেননা, এবং নির্বাচন বয়কটের আহ্বান করে থাকেন, তারাও এই মুহূর্তে রাজনৈতিক সংকটে পড়েছেন। অন্যান্য বামফ্রন্ট-বিরোধী বাম দলগুলোর চরম ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে বলা যায় এই দলটি লালগড় আন্দোলনের সূত্রে রাজ্যবাসীর একটা পরিমাণে নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের আগেই তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এলাকায় আধিপত্য বিপ্লবের কর্মসূচিটি যৌথ বাহিনী এবং সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর আক্রমণের সামনে ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তারা তৃণমূলের সাথে একপ্রকার সমঝোতা করে তৃণমূলের কর্মী-নেতাদের সামনে রেখে পুনরায় পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি-র কার্যকলাপ বাড়াতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে তৃণমূল দলটি দ্রুত জঙ্গলমহলে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং নির্বাচনে ওই অঞ্চলের বেশিরভাগ আসনে বিজয়লাভ করে। কিন্তু মাওবাদী রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা ও বাস্তবতা দুইই বড়ো রকমের ধাক্কা খায়। একটি প্রাণবন্ত আন্দোলনের সম্ভাবনাকে কীভাবে ধ্বংস করা যায়, লালগড় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মাওবাদীদের ক্রিয়াকলাপ সম্ভবত তারই সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

এই প্রেক্ষিতে নন্দীগ্রাম ও লালগড় সংঘটিত আন্দোলন দুটি যে দু'ধরনের ফলাফল প্রসব করলো, তার সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। তৃণমূল দলের উত্থানের পেছনে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের ভূমিকা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে, সিঙ্গুর আন্দোলন থেকেও নন্দীগ্রামের আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেসের বামফ্রন্টের বিকল্প শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে অনেক বেশি সাহায্য করেছে। কারণ মূলত এটাই যে, নন্দীগ্রাম আন্দোলন সিপিএম এবং সরকারের অবর্ণনীয় আক্রমণ ও নির্যাতন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছে, এবং সর্বোপরি সিপিএম নেতৃত্বের ঘোষিত ঘেরাও-দমন অভিযানকে পরাস্ত করে গোটা এলাকা সিপিএমের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। আন্দোলন চলাকালীন নন্দীগ্রামের এক মহিলা উপনিবেশিক আমলে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে স্বাধীন সরকার ঘোষণার সাথে বর্তমান আন্দোলনের তুলনা করে বলেছিলেন, “ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরাই প্রথম স্বাধীনতা এনেছিলাম, আর এটা হল আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতার লড়াই।” (তথ্য-চিত্র : *উন্নয়নের নামে*) ক্ষমতা-মদমত্ত সিপিএমের শক্তিকে যে পরাস্ত করা যায়, এই বার্তা, এই বিশ্বাস গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে দিয়েছিল নন্দীগ্রাম। আজ এটা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, সিপিএমের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের যে লড়াই ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামের মানুষ শুরু করেছিল, তারই সূত্র ধরে গোটা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নিপীড়িত মানুষ ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বামফ্রন্টকে নির্বাচনে পরাস্ত করলেন। আর তৃণমূল কংগ্রেস নন্দীগ্রাম এবং অন্যান্য কৃষক আন্দোলনে মুখ্য সহযোগী ভূমিকা পালন করার সুবাদে তার রাজনৈতিক ফসল ঘরে তুললো।

এরই বিপরীতে লালগড় আন্দোলনের পরিণতি আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি যে, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এরাজ্যে মাওবাদী রাজনীতির পুনরুত্থান হয়। কিন্তু মাওবাদী নেতৃত্ব আন্দোলনকে জনগণের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয় নি। এই নেতৃত্ব আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করে তাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাওবাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপ দমনের নামে বামফ্রন্ট ওই এলাকায় যৌথ বাহিনী নামায় এবং পাশাপাশি সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর শিবির গড়ে তুলে এলাকা দখল শুরু

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

করে। অচিরেই লালগড়ের জনপ্রিয় আন্দোলনটি মাওবাদী দল ও রাষ্ট্র-শক্তির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে পর্যবসিত হয়। এই অসম যুদ্ধে শুরুতে মাওবাদীরা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় বাহিনী এবং সিপিএমের হার্মাদরা বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। দমন-পীড়নের আবহে জনগণের সক্রিয়তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির একাধিক নেতাকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। ফলে এই গণ-কমিটি ক্রমাগত অকার্যকর হয়ে পড়ে। একইভাবে মাওবাদী নেতা শশধরকেও পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। কিন্তু পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণ-জমায়েত ও গণ-প্রতিরোধের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়ে লালগড় আন্দোলন শুরু হয়েছিল, গণ-প্রতিবাদের সেই রূপ আর ফিরে আসে না।

ইতিমধ্যে বিধানসভা নির্বাচন সমাগত হলে কমিটির অন্যতম নেতা ছত্রধর মাহাতো জেল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। মাওবাদীরা নির্বাচন বয়কটের ডাক দিলেও ভোট দিতে কাউকে বাধা দেবে না বলে জানায়। দেখা যায়, মাওবাদীদের ভোট বয়কটের রাজনীতি গোটা জঙ্গলমহলে কোনো ছাপ ফেলতে পারে না। মাওবাদী অধ্যুষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলোতে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে লাইনে দাঁড়ান। গোটা রাজ্যে যেখানে ভোট পড়েছে ৮৪.৪৬ শতাংশ, সেখানে সর্বাধিক মাওবাদী অধ্যুষিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিনপুর, শালবনী, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম এই পাঁচটি কেন্দ্রে গড়ে ভোট পড়েছে ৮৬.৭ শতাংশ, পুরুলিয়ার বান্দোয়ান, বাগমুণ্ডি ও বলবামপুরে ভোট পড়েছে গড়ে ৮১ শতাংশ এবং বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ও রায়পুরে গড়পরতা ভোট পড়েছে ৮৫.৮ শতাংশ। এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এইসব এলাকার মানুষের নির্বাচন তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি যথেষ্ট আস্থা আছে। তাই মাওবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক উপেক্ষা করে তারা ভোট দিতে এসেছেন। নির্বাচনী ফলাফল থেকে প্রমাণ হয় যে, নির্বাচনে জঙ্গলমহলের মানুষ সিপিএমের পাশাপাশি মাওবাদী রাজনীতির প্রতিও অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। প্রশ্ন আসে, মাওবাদীরা তাহলে কোন্ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছেন?

আরেকটা সম্ভাবনা হলো, মাওবাদীরা নিজেরাই জনগণকে ভোট দিয়ে তৃণমূল দলকে জেতাতে পরামর্শ বা নির্দেশ দিয়েছেন। অতীতে অন্ধ্রপ্রদেশে এরকম চোরা পথে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কোন কোন পার্টিকে জয়লাভে সাহায্য করেছেন বলে সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও মাওবাদী নেতা কিষাণ বেশ কিছুদিন আগে একটি টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁরা মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে বাঁচার জন্য এই দলটি তৃণমূলকে জঙ্গলমহলে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। সেজন্যই প্রধান শত্রু সিপিএমকে পরাস্ত করার জন্য নির্বাচনে তাদের তৃণমূলকে সমর্থন করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কোন্ নীতি অনুযায়ী তারা প্রকাশ্যে ভোট বয়কটের কথা বলেন, আর গোপনে বিশেষ কোন শাসক দলকে মদত করেন? এমন দ্বিচারী নীতি অনুসরণকারী দলের প্রতি মানুষের বিশ্বাস কীভাবে থাকবে? আর দলটি এখন কীভাবেই বা নতুন সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে সামিল করবে? উপরোক্ত দুটি সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, মাওবাদী পার্টি অনুসৃত রাজনীতি আসলে বাস্তবতার সাথে মিলছে না, আর মিলছে না বলেই এই দলের নেতৃত্ব যেমন লালগড় আন্দোলনের অগ্রগতি বা জঙ্গলমহলের জনগণের ইপ্সিত জয়লাভে সহায়ক হয়নি, তেমনি এই দলের হাত ধরে এ রাজ্যে বামপন্থার কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করাও সম্ভব নয়।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ করলে একটা অদ্ভুত স্ববিরোধী পরিস্থিতির মুখোমুখি হই আমরা। একদিকে আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থার আজও শক্তিশালী একটা অবস্থান রয়েছে, এতটাই যে সদ্য-সমাপ্ত নির্বাচনে প্রধান সংসদীয় দুটি রাজনৈতিক দলকেই বামপন্থার নাম করে মানুষের সামনে ভোট চাইতে হয়েছে। এই নির্বাচনী লড়াইয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষক সংগ্রাম, লালগড়ের আদিবাসী সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে এই আন্দোলনগুলোতে কোন্ দল কী ভূমিকা নিয়েছে তারই বিচারে। গণ-আন্দোলনের পক্ষে কে আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিপক্ষে কে, এটাই ছিল মূল বিচার্য বিষয়। আর এই বিচার করেছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ, প্রধানত রাজ্যের নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষ। জনমতের নিরিখে বিজয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, যে দলটি এদেশের বুর্জোয়া-জমিদার শাসকদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি কংগ্রেস দল ভেঙ্গে গঠিত হলেও এবং কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারে অংশগ্রহণ করলেও রাজ্যের জনগণের রুটি-রুজি-গণতন্ত্রের সংগ্রামে ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার সুবাদে বামপন্থী নামধারী দলগুলোর থেকেও বেশি বামপন্থী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিচার করেছেন। কার গায়ে কী ছাপ আছে বা মুখে কে কী বলছেন তা দিয়ে নয়, দলগুলোকে বিচার করেছেন গণ-আন্দোলনের কষ্টিপাথরে তাদের ভূমিকা বিচার করে।

অন্যদিকে আমরা দেখি, রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে বামপন্থার এমন শক্তিশালী অবস্থান থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

দলগুলো চরম সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। রাজ্যের ক্ষমতায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলো বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে জনবিরোধী অত্যাচারী শাসক হিসেবে ধিকৃত হয়েছে। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে তাদের এখন দীর্ঘ সময় এবং সাধনা লাগবে। বামফ্রন্ট-বর্হিভূত অন্য বাম দলগুলোর অস্তিত্ব এতোই ক্ষীণ এবং রাজনৈতিক কুশলতার এতই অভাব যে, সিঙ্গুর থেকে শুরু করে রাজ্য-রাজনীতিতে যে বামপন্থী হাওয়া বইতে শুরু করলো, নন্দীগ্রামে গিয়ে যা বামপন্থার ঝড় সৃষ্টি করে মেকি বামদের মুখোশ খুলে নগ্ন করে দিল, সেই হাওয়ার গতি-প্রকৃতি বুঝতেই তাদের বেলা বয়ে গেল। সম্বিত যখন ফিরলো তখন দেখা গেল বাম হাওয়া চুরি হয়ে গেছে। ফলে তাদের বামপন্থার আগ-মার্কা অস্তিত্ব বজায় রাখতে নির্বাচনের সময় কোমর বেঁধে বাম হাওয়ারই বিরুদ্ধাচারণ করতে হলো।

সবশেষে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বামপন্থীদের একটা বড়ো সমস্যা হচ্ছে, তারা নিজেদের সাধারণ মানুষের থেকে বিজ্ঞ এবং অগ্রণী বলে মনে করেন। সকল দলের নেতারাই মনে করেন, তাদের দলীয় কর্মসূচিতে জনগণের আন্দোলন-বিপ্লব-মুক্তির জন্য সবচেয়ে খাঁটি পথের সন্ধান দেওয়া আছে, জনগণ সেটা ধরতে বুঝতে পারছেন না, সেটা আসলে জনগণেরই দুর্বলতা। গত পাঁচ বছরের ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে, কোনও বামপন্থী দলের নেতারাই কিন্তু জনগণের গতিবিধি চিন্তা-চেতনা বুঝে উঠতে পারেন নি, ফলে তারা গণ-আন্দোলনের পেছনে দৌড়ে বেড়িয়েছেন, সামনের সারিতে আসতে পারেন নি। জমি আন্দোলনের গুরুত্ব যথাসময় বুঝতে পারলে কলকাতার উপকণ্ঠে রাজারহাট-ভাঙ্গরে যখন জমি অধিগ্রহণ হয়েছে, সেখানকার কৃষকরা যখন তৃণমূলের কাছে দরবার করে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন (তৃণমূল নেতৃত্ব তখনো কৃষক আন্দোলনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেনি), তখন ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও কোন বামপন্থী দল সেই আন্দোলনকে সংগঠিত করে কৃষক আন্দোলনের মিত্র শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারত। এবং জমি রক্ষা আন্দোলনের সেই অভিজ্ঞতা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কাজে লাগাতে পারলে বামপন্থী শক্তির পুনরুজ্জীবন এইসব আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই হয়তো বা হতে পারত।

আবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় ঘটে যাওয়ার পরেও সিপিএমের মতো একটা দলকে যে গণ-আন্দোলন ও নির্বাচনী সংগ্রামের মাধ্যমে 'পশ্চাদপদ' গ্রামীণ মানুষগুলো ক্ষমতাচ্যুত করে দিতে পারেন, বামফ্রন্টের পাকা-মাথা নেতাদের মতো বামপন্থা বা বিপ্লবী লাইনের 'প্রকৃত' প্রবক্তারাও বুঝি তা কল্পনায় আনতে পারেননি। মাওবাদী নেতৃত্ব এই সেদিনও বলেছেন, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সিপিএমকে এ রাজ্যের শাসনক্ষমতা থেকে হটানো সম্ভব নয়।

আসলে নিম্নবর্গের স্বকীয় চেতনাকে উচ্চ-বর্গ থেকে আসা বাম ও বিপ্লবী নেতৃত্ব কোনদিনই মর্যাদা দেয়নি, আজও দেয় না। নীচু তলা থেকে, তথাকথিত অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষদের থেকে, পার্টি-বহির্ভূত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মানুষদের থেকে কিছু শেখার আছে, সকলের সাথেই আদান-প্রদান করার প্রয়োজন আছে, স্বঘোষিত অগ্রণীরা একথা ভাবতে পারেন না। এবারের নির্বাচন প্রমাণ করলো, এইসব নেতাদের থেকে জনগণ অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক। লক্ষ্য করুন, এই নির্বাচনে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ বিভিন্ন এলাকার আন্দোলনকারী মানুষের স্বার্থে যে সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে পরাজিত করা দরকার, এটা কেবল আক্রান্ত ভুক্তভোগী মানুষেরা বুঝেছেন তাই নয়, এই চেতনা গোটা রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। অন্য গ্রামীণ এলাকা থেকে সিঙ্গুরে সিপিএমের মিছিলে আসা কৃষকের সাথে আলোচনা করে দেখেছি, তারা কৃষি জমিতে শিল্প গড়ার বিরুদ্ধে করা বলছেন। বামফ্রন্ট নেতৃত্ব ভেবেছিলেন, তার যেমনটা বোঝাবেন গ্রাম-শহরের 'পিছিয়ে পড়া' মানুষ তাই বুঝবেন। একইভাবে বামফ্রন্ট-বিরোধী বামপন্থীরাও ভাবেন, আসলে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত চেতনা না থাকার ফলে মানুষ ভুল বুঝে কখনো সিপিএম কখনো বা তৃণমূলের পেছনে চলে যাচ্ছেন, তাদের পার্টি-লাইন বুঝিয়ে বামপন্থায় দীক্ষিত করতে হবে, পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলনে সামিল করতে হবে। বামপন্থীদের ভাবনার সাথে মানুষের ভাবনা মেলে না। অন্যদিকে মানুষের ভাবনা অনুধাবন করে বামপন্থীদের কর্মসূচি তৈরি হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ থাকেন সাধারণ মানুষের জায়গায়, আর বামপন্থীরা থাকেন তাদের কল্পনায়। এ দুয়ের মেল-বন্ধন হয় না। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন তাই স্বপ্ন হয়েই থেকে যায়।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

শুরু হোক প্রকৃত বামপন্থার পুনরুজ্জীবন

সুকান্ত রায়

'পরিবর্তন'-এর এই ঝোড়ো হাওয়ার দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অবস্থা কী, বিপ্লবী আন্দোলনের অবস্থা কী এবং তার ভবিষ্যতই বা কী তা নিয়ে নতুন করে একটি স্টক-টেকিং বোধ হয় 'পরিবর্তিত' পরিস্থিতিতে করে নেওয়া যেতে পারে। 'পরিবর্তন'-এর ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চালচিত্রের অনেক কিছুই যেমন পাল্টে গেছে, তেমনি এখানকার কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের উপরেও যে তার প্রভাব পড়েছে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এক কথায় বলতে গেলে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলনের পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক। আবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিচারে এই আন্দোলন এক চমৎকার অবস্থার দোরগোড়ায়। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই দুটি পরিস্থিতির সহাবস্থান নিশ্চয়ই কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

প্রথমেই আসা যাক আজকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথায়। কোন সন্দেহ নেই যে সংসদীয় ব্যবস্থা ভারতের রাজনীতিতে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে। এ বাস্তবতা যাঁরা বুঝবেন না, বা যাঁরা একে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না, তাঁরা বিপ্লবী বা অবিপ্লবী কোন রাজনীতিতেই দন্তস্ফুট করতে পারবেন না। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে তাতে এখানকার রাজনীতির বৃত্তটি প্রায় একশ' ভাগ নির্বাচনী রাজনীতি বেড়াজালে আটকে গেছে। আর এখানেই শাসকশ্রেণী সব চেয়ে বড় বিজয়টি অর্জন করে ফেলেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ ছোট বড় সব আন্দোলনেরই অন্তিম পরিণতি নির্বাচনী সাফল্য বা অসাফল্য। বামপন্থীদের রাজনৈতিক পরিভাষা থেকেও শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ, শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা, শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ বা তার সঙ্গে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর আন্দোলনের সম্পর্ক, শাসক শ্রেণীর, তার অর্থনীতির, তার রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন, এক কথায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিষয়টি ধুয়ে মুছে গেছে। নির্বাচন-সর্বস্বতা ডান-বাম সব ধরনের রাজনীতিকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এমনকি জঙ্গল মহলের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডও গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনী 'পরিবর্তন'-এর কাছে আত্ম-সমর্পণ করলো। সংসদীয় রাজনীতির এই সর্বময় জয়যাত্রা নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট বিপ্লবী রাজনীতির বিকাশের পক্ষে একটি অন্তরায়।

এবার আসা যাক কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবিরের কথায়। বিচিত্র সব বিজাতীয় ঝোঁক এই শিবিরের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়েছে। তার মধ্যে একটি এই যে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার প্রকৃত প্রতিভূ হচ্ছে সিপিএম। তাই বামপন্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সিপিএম-কে বাঁচিয়ে রাখাই এই মুহূর্তের মূল রাজনৈতিক কর্তব্য। তারা মনে করেন সিপিএম-এর অনেক দোষত্রুটি ঘটেছে। বিশেষত বুদ্ধের আমলে বেশ কিছু অবিমৃষ্যকারিতার কারণে পার্টির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু তাতে পার্টির মূল রাজনীতি ভুল প্রমাণ হয়ে যায় না। এঁরা পার্টির গায়ে লেগে যাওয়া কলঙ্কমোচন করে পার্টিটিকে তার আদি মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করতে তাদের কলমকে পণ করেছেন। যে পার্টিটি ১৯৬৪ সালে তার জন্মমুহূর্ত থেকে স্থির নিশ্চয়তার সঙ্গে "দক্ষিণ"-পথে যাত্রা শুরু করে ২০০৭-এ নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র কৃষকদের গণহত্যার মধ্য দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ করলো, এরই মধ্যে ১৯৯২-তে 'সময়োপযোগী পার্টি-কর্মসূচি' রচনা, ১৯৯৪-তে বিকল্প শিল্পনীতি গ্রহণ, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ম্যাক্‌কিনসের উপর শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্যের রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব প্রদান, ২০০৩-এ সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গে 'সেজ' বিল পাশ, কেন্দ্রের ২০০৫ সালে আনীত 'সেজ' আইন সমর্থন এবং ২০০৬-এ সিঙ্গুর ও ২০০৭-এ নন্দীগ্রাম— এ সবই তো একই রাজনৈতিক সূত্রে গাঁথা! মার্কসবাদের এই বহু-চর্চিত বিষয়টি, যে একটি শোধনবাদী রাজনীতি নিবিড়ভাবে অনুশীলন করে গেলে একটি বামপন্থী পার্টি সর্ব অর্থেই বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হয় এবং জনগণের সেবার তুলনায় পুঁজির সেবাতেই বেশি নিয়োজিত হয়— মার্কসবাদের এই বহুচর্চিত বিষয়টির সত্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হলো আমাদেরই রাজ্যে। আমাদের যে বন্ধুরা সিপিএম-কে বাঁচাবার মরিয়া প্রচেষ্টায় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বুদ্ধবাবুদের এক বিভাজন টানার চেষ্টা করছেন তারা ভুলেও স্মরণ করতে চান না যে পার্টিটির প্রতিটি পুঁজিবাদী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা অনুমোদিত। সব চেয়ে বিস্ময়কর লাগে যে সিপিএম-এর মধ্যে যখন ক্ষীণভাবে হলেও বিপ্লবী সম্ভাবনা ও বিপ্লবী উপাদান ছিল তখন যাঁরা দৃঢ়ভাবে তার সংশোধনবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, সিপিএম যখন স্পষ্টভাবে একটি বুর্জোয়া দলে পরিণত হলো তখন তারা তাকে একটা কমিউনিস্ট দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এ সবই তাঁরা করছেন এক নব-আবিষ্কৃত আত্মোপলব্ধির ভঙ্গিতে, দীর্ঘকালের পরিপোষিত গোঁড়ামিবাদ থেকে বেরিয়ে আসার আত্মপ্রসাদ লাভ করতে করতে। কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবিরেরই একটি অংশের এই অধঃপতন অবশ্যই এই শিবিরেরই একটি দুর্বলতার সূচক যার উৎস নিহিত রয়েছে এর দুর্বল মতাদর্শগত গঠনের মধ্যেই।

কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবিরের এই অন্তর্লীন মতাদর্শগত দুর্বলতার আর একটি জঘন্য বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এই শিবিরেরই একটি অংশের তৃণমূল কংগ্রেসের পিছনে দৌড়নোর মধ্যে। মমতা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল ঐতিহ্যগতভাবে বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের জয় করে নেবার জন্য একটি 'বাম' মুখোশ ধারণ করার। সেটি তিনি যাতে সফলভাবে করতে পারেন তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এই প্রাক্তন নকশালপন্থীরা। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় অকৃতজ্ঞ নন। তাঁদের দু'হাত ভরে এমন পুরস্কার দিয়েছেন যাতে তাঁরা তাঁদের অতীত জীবনকে করুণার চোখে দেখেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবার পর আবার নতুন করে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে নানাভাবে তাঁর প্রসাদপুষ্ট হবার জন্য। কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবিরের কাছে ভবিষ্যতের জন্য লুকিয়ে আছে আর একটি গুরুতর বিপদ। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবী গ্রুপ যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই এক সঙ্গে কাজ করেছে, তাই আজ যারা মন্ত্রী বা তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন উচ্চ পদাধিকারী তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নানা স্তরের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে রয়েছে। এঁরা বিপ্লবী রাজনীতি বিসর্জন দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন নি, কিন্তু এঁদের মধ্যে একটা ঝোঁক কাজ করবে নানা ধরনের আইনি সহায়তা নেবার জন্য বা এমনকি নিজেদের রাষ্ট্রীয় আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারস্থ হবার। তৃণমূল কংগ্রেসের যেহেতু একটা র‍্যাডিক্যাল ইমেজ বজায় রাখতে হবে তাই সে এ সাহায্যের যোগান দিয়ে যেতে কার্পণ্য করবে না। এইভাবে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এই অংশটি প্রাতিষ্ঠানিকতার বেড়াজালে জড়িয়ে পড়বে, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অচেতনভাবেই। মনে রাখা উচিত যে সংসদীয় রাজনীতির এই দাপট এবং প্রতিষ্ঠানিকতার একটি দুর্মর শক্তি আমাদের দেশে সংশোধনবাদী রাজনীতির এক অনুকূল ভিত্তি রচনা করে চলেছে প্রতিটি মুহূর্তে, নিরবচ্ছিন্নভাবে।

এরই অতি- প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে মাওবাদীদের অতি-বাম বিচ্যুতি। তাঁরা ভারতীয় সমাজের বাস্তবতাকে ঠিক মতো বুঝেই ওঠেন নি। তাঁরা মনে করছেন ভারতে বিপ্লবী পরিস্থিতি রয়েছে। সেই অনুসারে তাঁরা রণনীতি ও রণকৌশল নির্মাণ করেছেন। এর পরিণতিতে তাঁদের "তিক্ত আত্মত্যাগ ও সাহসী সংকল্প" সত্ত্বেও দীর্ঘ দীর্ঘ বছরের প্রচেষ্টাতে সামান্য কিছু বনাঞ্চলের বাইরে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় নি। এমন কি বনাঞ্চলেও তাদের সাংগঠনিক শক্তি কমে আসছে, আর গোটা ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সামাজিক প্রভাব নেহাতই প্রান্তিক ধরনেরই রয়ে গেছে। তবু যে গভীর বিশ্বাসে তাঁরা বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরেছেন এবং আত্মত্যাগের যে নিদর্শন রাখছেন তাতে প্রমাণ হয় এই দলটি বিপ্লবী উপাদানে ভরা। কিন্তু সঠিক রাজনৈতিক দিশার অভাবে এ শক্তিটিও ধীরে ধীরে ক্ষয় পাবে।

এর বাইরে আছে অসংখ্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী গ্রুপ, তারা কেউ ছোট, কেউ বা বড়ো। তারা ছড়িয়ে আছে ভারতের প্রায় প্রতিটি জেলায়। এরা সকলেই বিপ্লবী বামপন্থায় বিশ্বাসী, সংশোধনবাদ ও অতি-বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে নিজের নিজের সাধ্যমত লড়াই জারি রেখেছে। কিন্তু সাধারণভাবে একটি রাজনৈতিক দিশাহীনতায় ভুগছে। বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্বিক বিপর্যয় তাদের মধ্যে এক হতাশার সৃষ্টি করেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় বিপ্লবের সম্পর্কে এক স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। এঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না কেন এত দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টাতেও একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠছে না। এই পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে অবসাদ সৃষ্টি হচ্ছে, আর কাজেকর্মে পড়ছে গতানুগতিকতার ছাপ। এই পরিস্থিতি বিপ্লবী আদর্শের প্রতি আনুগত্যকে দুর্বল করে দেয়। যে পরিমাণে তা দুর্বল হয় সেই পরিমাণেই জনগণের মঙ্গলের তুলনায়, বিপ্লবী স্বার্থের তুলনায়, ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বা গোষ্ঠীগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতি ঝোঁক প্রাধান্যে চলে যাচ্ছে। বিপ্লবের প্রতি একটি সাধারণ বিশ্বাসের এবং দৈনন্দিন কিছু সাংগঠনিক কাজকর্মের আচরণের অন্তরালে নিভৃতে গড়ে উঠছে সংকীর্ণ মানসিকতা আর আশাহীনতা।

এই হলো বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্বিক সঙ্কটের এক ছবি।

কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের বিষয়ীগত প্রস্তুতির এই দুরবস্থার মুহূর্তেই এমন কিছু নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সময়টিই হতে পারে বিপ্লবী বামপন্থার অগ্রগতির সূচনা বিন্দু, যা বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে বিগত তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে অনুকূল সময়। শুধু তাই নয়, বিপ্লবী বামপন্থার বিকাশ ঘটানো ঐতিহাসিকভাবে এখন একটি 'আবশ্যিক' কাজে পরিণত হয়েছে। সিপিএম সম্পর্কে বিপ্লবীদের বিগত কয়েক দশকের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার সিপিএমের রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মোহমুক্তি ঘটাতে পারে নি। এটা ব্যাপকভাবে ঘটেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তিক্ষয় তখন থেকেই শুরু হয়েছিল, তা চরম রূপ নেয় বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের ফলে। সিপিএমের রাজনীতি সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের মেহনতি মানুষের মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতেই জন্ম নেয় ফ্যাসিবাদ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৃণমূলের সাড়ম্বর উত্থান তার উপাদানটিও তৈরি করে রেখেছে। ঐ পরিস্থিতির জন্য প্রধানত সিপিএমই দায়ী। সিপিএমের জনবিরোধী রাজনীতির কারণেই মানুষের আজ লাল ঝান্ডার প্রতি হয় ঘৃণা, নয়তো উদাসীনতা তৈরি হয়েছে। মানুষ সিপিএমকেই লাল ঝাণ্ডার প্রতিভূ হিসেবে জেনেছে। বিশ্বে এবং আমাদের দেশে প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে সিপিএমকেই মানুষ সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে ভেবেছে এবং তার সমস্ত অপকর্মকে কমিউনিজমের কুফল বলে ভেবেছে। এইভাবে এই পার্টিটি দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকেই এক স্থায়ী ক্ষতি করে দিয়েছে। আমাদের যে বন্ধুরা সিপিএমের পতনকে বামপন্থার পতনের সঙ্গে সমার্থক করে দেখছেন এবং বামপন্থাকে বাঁচাবার জন্য সিপিএমকে বাঁচাবার ব্রত নিয়েছেন তাঁরা মার্কসবাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন। লাল ঝান্ডাকে বাঁচাতে গেলে তার প্রাক্-শর্তই

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

হচ্ছে সিপিএমের রাজনীতিকে সম্পূর্ণ নাকচ করা আর তৃণমূলের বামপন্থী ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেওয়া। একমাত্র কমিউনিস্ট বিপ্লবীরাই পারেন এই কাজটি হাতে নিতে। সিপিএম বামপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছে এবং সেই শূন্যতা ভরাট করতে স্বৈরতন্ত্রের সকল লক্ষণাক্রান্ত তৃণমূলের যে অভিযান, তাকে প্রতিহত করতে এক ঐতিহাসিক কর্তব্য আজ ন্যস্ত হয়েছে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের হাতে।

এখন প্রশ্ন হলো, কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কি এ কাজের যোগ্য? এর উত্তর একই সঙ্গে হ্যাঁ এবং না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে বিগত দশকগুলিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তা জোড়া রয়েছে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্বিক বিপর্যয়ের সাথে। যে গভীর মতাদর্শের দুর্বলতা এ আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই পরিলক্ষিত হয় তার সাথে কি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্বগত বিকাশের ক্ষেত্রে রুদ্ধতার কোন সংযোগ নেই? এ আন্দোলনকে যারা আজকের ভারতে অপ্রাসঙ্গিক বলতে পছন্দ করছেন, এত দিনেও একটি পার্টি গড়তে না পারার জন্য 'উদ্বেগ' বোধ করছেন, তাদের কাছে কি বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনও অপ্রাসঙ্গিক? পৃথিবীর কোন্ দেশেই বা বলার মতো একটি কমিউনিস্ট পার্টি আছে? অথচ আমরা জানি কমিউনিজমের জয় অনিবার্য, পুঁজিবাদের ধ্বংসও অনিবার্য। তাই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার সংগ্রাম দেশে দেশে জারি থাকবেই। ভারতের ক্ষেত্রে এ সংগ্রামের মূল ক্ষেত্র একমাত্র কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবির, যারা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং বিপ্লবের মৌল নীতিগুলিকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছেন। আবার এই মুহূর্তের বিচারে তাঁদের যোগ্যতা গুরুতর প্রশ্নের সামনে রয়েছে। আজকের পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এই হতদ্দশা কেন তা বোঝার জন্য তাদের দেখাতে হবে এক অনুসন্ধানী মানসিকতা। তাদের এই উপলব্ধিতে অবশ্যই পৌঁছতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন মার্কসীয় তত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটানো। তাদের সচেতনভাবে পরাজিতের মানসিকতা কাটাতে হবে, বুঝতে হবে ২০০৮ সালের মহা-মন্দার পরে সমগ্র পৃথিবীতেই পুঁজিবাদের অমীমাংসেয় বিরোধ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব ভিত্তি রচনা করছে। মেকি বামপন্থার মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ভিত্তি তৈরি হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন নিবিড় তত্ত্ব অনুশীলনের সাথে প্রতিবাদী, লড়াকু, মেহনতি মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, সর্বহারা ও আধা-সর্বহারাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার প্রসার ঘটানোর লাগাতার প্রচেষ্টা। জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি স্তরে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংগ্রামে লেগে থাকা এবং এইভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের এক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করা।

কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনে যে পাহাড়-প্রমাণ দুর্বলতা আছে তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, বামপন্থার বিকাশ অন্য কোন জমিতে করা যায়। যদি কিছু করার থাকে তা করতে হবে কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনেরই পরিসরে। এ কথা মনে রেখে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অনেক বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে হবে, দুর্বলতাগুলি কাটাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

হ্যালো নিরুপমবাবু...

৪ পৃষ্ঠার পর

বলছিলাম তিনি ঠিক সেটাই প্রমাণ করে দিলেন— ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জমি শুধু ফেরতই নেওয়া যায় না, তা কৃষকদের হাতে ফিরিয়েও দেওয়া যায়। এমনকি যে বর্গাদার ও ভূমিহীনদের স্বার্থ দেখা হচ্ছে না বলে আমরা তাঁর সমালোচনা করছিলাম, সে ব্যাপারেও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা আপনারা কী করলেন? আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত নাক খৎ দিয়ে স্বীকার করলো যে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে রাজ্য পার্টি ও সরকারের ভুল নীতির জন্যই আপনাদের 'চোখের মণি' বামফ্রন্ট সরকারের ভরাডুবি ঘটেছে। শুধু তাই নয়, যা আপনারা 'অসম্ভব' বলে দাবি করেছিলেন সেই সিঙ্গুরের জমি আবার সরকারের হাতে নিয়ে নেবার জন্য এবং জমি বিক্রি করতে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে নতুন সরকার যে সিঙ্গুর বিল বিধানসভায় তুললো, তার পর্যন্ত বিরোধিতা না করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাদের নির্দেশ দিলো। এটাই আমাদের কাছে ধাঁধাঁ। এই ধাঁধাঁরই উত্তর আমরা পাচ্ছি না। তাহলে তো তখন, সিঙ্গুর আন্দোলন চলার সময়ে, সেখানকার লড়াকু কৃষকদের, তাদের সমর্থনে পথে নেমে আসা নাগরিক সমাজের মানুষদের এবং আপনাদের বিরোধী রাজনীতিকদের আপনারা এবং আপনাদের সুবিধেভোগী কতিপয় একদা-বিপ্লবী এবং কবি লেখক-শিল্পীরা যে বমি-উদ্রেককারী নর্দমার ভাষায় গালমন্দ করেছিলেন, তা-ও আবার গিলে নিতে হয়। প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে সেজন্য ক্ষমা চাইতে হয়! কিন্তু তা তো আপনারা করছেন না। বরং কয়লার কালোত্ব যে হাজার বার ধুলেও দূর হয় না, তা প্রমাণ করে দিয়ে নৈতিকভাবে সিঙ্গুর বিলকে সমর্থন জানিয়েও, 'টেকনিক্যাল' অজুহাতে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। এভাবে আপনারা কী প্রমাণ করতে চাইলেন? নিজেদের 'বাম' নামাবলী গায়ে-দেওয়া নয়া-উদারনৈতিক পন্থার 'সতীত্ব', না 'পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতি'-তেও 'দ্বান্দ্বিকতা'র প্রতি আপনাদের অটুট আস্থা? এই প্রশ্নের উত্তরটাই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

মাননীয় নিরুপমবাবু, আপনি কি অনুগ্রহ করে এই ধাঁধাঁটির সমাধানের পথ আমাদের বাৎলে দেবেন?

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বামপন্থীদের বিপর্যয়ের কারণ : একটি প্রাথমিক আলোচনা

রতন খাসনবিস

বামফ্রন্ট যে এই বিধানসভা নির্বাচনে হারতে চলেছে, তার লক্ষণ ছিল স্পষ্ট। ২০০৬ সালে বিপুলভাবে জিতে আসার পর বামফ্রন্ট প্রথম যে জনাদেশ মোকাবিলা করে সেটা হলো ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন। ঐ নির্বাচনে জেলা পরিষদ স্তরে যদিও বামফ্রন্টের দাপট অনেকটাই অক্ষুণ্ণ ছিলো, নির্বাচনের ফলাফল যাঁরা খুঁটিয়ে বিচার করেছিলেন, তাঁদের চোখে এটা পড়েছিলো যে, গ্রামাঞ্চলে যে নির্বাচনে স্থানীয় মানুষ প্রত্যক্ষ চেনা-জানার ভিত্তিতে ভোট দিয়ে থাকেন, সেই গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা বামফ্রন্ট তথা সিপিএম প্রার্থীদের বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছিলেন। যাঁদের তাঁরা চোখের সামনে বাম রাজনীতি করতে দেখেন, বোঝা গিয়েছিলো যে, তাঁদের তাঁরা আর পছন্দ করছেন না। বৃহত্তর স্তরে, অর্থাৎ জেলা পরিষদ স্তরে তখনও পর্যন্ত তাঁরা প্রধানত বাম প্রার্থীদেরই ভোট দিয়েছেন। কেননা, সেখানে এই বামফ্রন্টের বিপরীতে এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব তাঁদের নজরে আসে নি, যে শক্তির ওপর তাঁরা আস্থা রাখতে পারেন। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এসে দেখা গেল, সেটাও তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন, সেই জায়গাটায় তাঁরা শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। গ্রামাঞ্চলে বামফ্রন্টের ভীত আলগা হয়ে গেছিলো আগেই, যে কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতে তাঁরা হারছিলেন। এবার এলো ইমারত ভাঙার দিন, ২০১১ সালে সর্বশক্তি দিয়ে নেমে নিজেদের অনুকূলে ২০০৯ সালের চেয়ে ১০ লক্ষ বেশি ভোট নিয়ে এসেও বামফ্রন্ট এই ভাঙন ঠেকাতে পারলো না। শহরাঞ্চলে বামফ্রন্ট চিরদিনই তুলনামূলকভাবে দুর্বল। ২০১০ সালের পুরসভা নির্বাচনে বোঝা গেল, সেখানে তাঁরা আরও দুর্বল হয়েছেন ইতিমধ্যে। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে শহরাঞ্চলে তাঁরা যে শূন্য হাতে বিদায় নেবেন, এটাও তাই ছিল প্রত্যাশিত।

যে কোন সাধারণ মানের রাজনৈতিক বিশ্লেষকের চোখেই এসব ধরা পড়ার কথা। বাম নেতারা কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত বলে গেছেন 'অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার' হচ্ছেই। কারণ কী? এঁরা কি আদৌ এসব বুঝতেন না? এক সংবাদ-বিশ্লেষক বলেছিলেন, ঠিক তা নয়। নির্বাচনী যুদ্ধে নেমে কোন্ পক্ষ বলে যে, 'আমরা হারছি'? কথাটা সত্যি। কিন্তু পুরো সত্যি নয়। সেটা হলে, ভোট মিটে যাওয়া এবং ফল প্রকাশের মধ্যেকার সময়ে বাম নেতারা জেতা নিয়ে এত বেশি কথা বলতেন না। রাজ্য নেতারা জেতা নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। নিশ্চিত ছিলেন, কারণ জেলা নেতারা সেরকম রিপোর্টই দিয়েছিলেন। জেলা নেতারা এই আশাবাদী রিপোর্ট দিয়েছিলেন, কারণ আঞ্চলিক এবং স্থানীয় নেতা, জনগণের সঙ্গে যাঁদের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কথা, যে সম্পর্ক থাকার কারণে বাজারী সংবাদপত্র বহুবার প্রাক্ নির্বাচনী সমীক্ষায় এঁদের হারিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, বিপুল ভোটে এঁরাই ফিরে এসেছেন ক্ষমতায়, সেই সম্পর্কটা কি আদৌ বজায় ছিলো ইদানিং? উত্তরটা নেতিবাচক। পার্টি যেহেতু ক্ষমতার উৎস, অনেকেই পার্টিতে এসেছেন ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার জন্য। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে হলে দল-নেতাকে তুষ্ট করে চলতে হবে। যদি আমি বুঝিও যে, দলের কার্যকলাপে মানুষ বীতশ্রদ্ধ, আমি সে কথা দলনেতাকে বলতে পারবো না। বললে আমি নেতার বিরাগভাজন হবো। বিরাগভাজন হলে আমি আর ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে পারবো না। সুতরাং আমাকে বলতে হবে, সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই। বরং ওখানে শিল্পের সম্ভাবনায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে বামফ্রন্টের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গেছে। নন্দীগ্রামে 'এমন কিছু' হয়নি যার জন্য বুদ্ধবাবুকে সরে যেতে হবে ইত্যাদি। নেতারা এসব যত শুনেছেন তত গলা চড়িয়েছেন তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিয়েছেন বিরোধীপক্ষকে। এসবের ফলে পতন আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। মানুষ আর বাছ-বিচার করেন নি। তৃণমূলের সিম্বল খুঁজে ভোট দিয়েছেন তাঁরা। কংগ্রেস যতোটা ভোট পেয়েছে তার প্রায় সবটাই তৃণমূলের জন্য দেওয়া ভোট।

রাজনৈতিক লাইন

বামফ্রন্টের এই দুরবস্থা হলো কেন? বামফ্রন্টের প্রধান শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। ফ্রন্টের ভালো-মন্দের প্রায় সবটাই হলো সিপিএম-এর ভালোমন্দ। এই দুরবস্থার কারণ খুঁজতে হলে প্রশ্নটা তাই কিছুটা বদলে এভাবে রাখতে হবে যে, সিপিএম এই অবস্থায় পড়লো কেন? রাজনৈতিক দলের পতন-উত্থানের কারণ খুঁজতে হয় প্রধানত তার রাজনৈতিক লাইনের মধ্যে। সঙ্গে অবশ্য থাকে সংশ্লিষ্ট নানা প্রশ্ন, লাইনের অনুশীলনের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো যার অন্যতম। তবে এই প্রাথমিক আলোচনায় আমরা সীমিত থাকবো রাজনৈতিক লাইনের ভ্রান্তি সংক্রান্ত বিষয়ে।

রাজনৈতিক লাইনের আলোচনায় অবশ্যই প্রথমে আসে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে বিপুল মাত্রায়। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একাংশের মতে এটি রণনীতির প্রশ্ন, রণনীতিগতভাবেই তাঁরা বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্বাচনে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

অংশগ্রহণের লাইনটিকে ভুল মনে করেন। বয়কট তাঁদের রণনীতিগত অবস্থান। বস্তুত, প্রথম যুগের নকশালপন্থীরাও এই রণনীতিগত অবস্থানেই অনড় ছিলেন। পরবর্তীকালে নানা প্রয়োগ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের একটা বড়ো অংশ এই অবস্থান থেকে সরে আসেন। অন্ধ্র, বাংলা ও বিহারে অনুশীলনরত নকশালপন্থীদের একাংশ অবশ্য আগের অবস্থানেই অনড় থাকেন। আজকের সিপিআই(মাওবাদী) গড়ে উঠেছে এই লাইনটিতে অনড় থাকা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিয়েই। ইদানিং অবশ্য এঁরাও আবার বুর্জোয়া নির্বাচনকে ব্যবহার করার কৌশল কাজে লাগাচ্ছেন, যদিও তাঁদের যা দলিলপত্র আমার নজরে এসেছে, তাতে তার উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। যাইহোক, রণনীতিগত প্রশ্নে নির্বাচন বয়কট এবং সশস্ত্র বিপ্লবকে নির্বাচন বয়কটের প্রেক্ষিতে পাল্টা রণনীতিগত অবস্থান হিসেবেই এই অংশের বিপ্লবীদের চিহ্নিত করা যায়। এদের লাইন ভুল কী ঠিক, সময় সেটা আরও ভালোভাবে বিচার করে দেবে। তবে ভারতের জনগণকে এই রাষ্ট্র যেভাবে ক্রমশ নির্বাচনমুখী করে তুলছে এবং রাষ্ট্র যেভাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মারফত ক্রমশ তার নির্বাচনী পরিধির বিস্তার ঘটাচ্ছে, তাতে মনে হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার হাত থেকে এঁদেরও নিস্তার নেই। যেভাবে, 'জনগণের কমিটি' ঝাড়গ্রামে বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো, অথবা যেভাবে কিষেণজীর তরফ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা হলো তাতে মনে হয়, বিষয়টির গুরুত্ব এঁরাও বুঝছেন এবং সেটা বুঝেই তাঁদের কঠোর রণনীতিগত অবস্থান থেকে তাঁরা নিজেরাই সরে আসছেন (ইতিপূর্বে অন্ধ্রেও এই ধরনের অনুশীলন লক্ষ্য করা গেছে সেখানকার মাওবাদীদের ক্ষেত্রে)।

নকশালপন্থীদের একটা বড়ো অংশ ইতিমধ্যেই বয়কটকে রণনীতিগত বিষয় হিসেবে দেখতে চাওয়ার লাইনটি ত্যাগ করেছেন। এই অর্থে তাঁরা ফিরে এসেছেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সিপিআই-সিপিএম অনুশীলিত ধারায়। এঁদের সঙ্গে সিপিআই-সিপিএমের তফাত এখন আছে আরও সূক্ষ্ম একটা জায়গায়। সেটা হলো, ভোটে জিতে ক্ষমতায় যাওয়া উচিত, কি উচিত নয়— এই প্রশ্নে। বলাবাহুল্য, এ তফাতও বেশি দিন ধরে রাখা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই এই নকশালপন্থীদের একাংশ এই রাজ্যের বামফ্রন্ট বিরোধী শাসক জোটের অংশীদার হয়ে গেছেন। অন্যরা এখনও এ প্রশ্নে অনড় অবস্থানই ধরে রেখেছেন— তাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বটে, কিন্তু শাসনক্ষমতায় যাবেন না। তবে তাঁদের অনুশীলনেও এটা দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চায়েত স্তরে ভোটে জিতলে এঁরা সরকারি ক্ষমতায় যতটা এই স্তরে নামিয়ে এনেছে ভারত রাষ্ট্র, তার সবটাই তারা কাজে লাগাচ্ছেন সংগঠন ধরে রাখার স্বার্থে। এঁরা অবশ্য এ কথা বলেন যে, পঞ্চায়েতে কী ক্ষমতাই বা দিয়েছে ভারত রাষ্ট্র! কথাটা ঠিক। তবে ভাবলে বোঝা যায়, যে ক্ষমতা ঐ স্তরে দেওয়া আছে সেটা রাষ্ট্রক্ষমতারই অংশ। সিপিএম একদা দিল্লীতে সরকারে যাওয়া নিয়ে যে নেতিবাচক অবস্থান নিয়ে রেখেছিলো, সেই রকম অবস্থানই তাঁরা নিয়ে রেখেছেন রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় আসা নিয়ে। অনুমান করা যায়, যদি কখনও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁদের অনুকূলে আসে এবং সে পরিস্থিতি পাল্টা রাষ্ট্র গড়ার অবস্থায় না পৌঁছায়, তবে তাঁদেরও এই অবস্থান বদলাতে হবে। আসলে রণনীতিগত অবস্থানে তফাত না থাকলে রণকৌশলগত অবস্থানের ভিন্নতা রক্ষা করা কঠিন— কমিউনিস্ট আন্দোলনের এটাও একটা শিক্ষা।

যাইহোক, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে এত কথা বলতে হলো এই প্রেক্ষিতটা সামনে আনতে যে, সরকারি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই এ রাজ্যের সিপিএম আজ এই দশায় এসে পড়েছে, এই বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি নেই। এভাবে ভাবলে বিষয়টি লঘু করে দেখা হবে। সশস্ত্র সংগ্রাম নৈরাজ্যবাদের হাত শক্ত করেছে, এই বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য হাজির করা সত্ত্বেও যেমন বলা যায় না যে সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটাই ভুল, অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতায় থেকে একটি পার্টি বিপর্যস্ত হলেও তেমনি বলা যায় না যে, ভোটের মধ্য দিয়ে সরকার গড়ার লাইনটাই ভুল। সমস্যাটা আরও গভীর। এই পার্টিই কেরলে গ্রহণ করে একই রাজনৈতিক লাইন। কেরলে পার্টির এই দশা কখনও হয়নি। এবারের নির্বাচনেও কেরালার বামফ্রন্ট বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছে। বস্তুত, দুই ফ্রন্টের মধ্যে ঐ রাজ্যে এবার মোট ভোটের ব্যবধান এক হাজারের কাছাকাছি। ভারতের কোনো রাজ্যে কখনও এটা ঘটেনি। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজ কেন্দ্রে হেরেছেন বিপুল ভোটে। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী তার নিজ কেন্দ্রে জিতেছেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে। লাইন নয়, গোলমাল আছে লাইনের অনুশীলনে। সেটা কী ধরনের, এ নিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যে সুস্থ বিতর্কের দরকার আছে।

রিলিফ, সমাজতন্ত্র ও নয়া উদারবাদ

বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতায় এসে একটা বামদল কী করতে পারে? খুব কিছু পারে না, কারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাই দাঁড়িয়ে থাকে সাম্রাজ্যবাদ, দেশী পুঁজি এবং ক্ষয়িষ্ণু প্রাক্পুঁজিবাদী (সামন্তবাদী) স্বার্থ রক্ষার জন্য। যেটা পারা যায় তা হলো এই অবস্থাতেই নিজেদের সীমিত ক্ষমতায় সাধ্যমতো প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ থেকে শ্রমজীবী মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করা, গণ-আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্র যে সব রিলিফ দিতে বাধ্য হয় সেগুলিকে আন্তরিকতার সঙ্গে রূপায়িত করা, আর ক্রমাগত রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা, যাতে শ্রমজীবী মানুষ বিদ্যমান ব্যবস্থার অসারতা আরও বেশি

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

উপলব্ধি করতে পারে এবং তার মধ্যে দিয়ে বিকল্প একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা— যে ব্যবস্থাটা প্রতিক্রিয়ার দাসত্ব থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে পারে— সেটি গড়ে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত এই কাজটির অর্ন্তনিহিত অর্থ হলো শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্র গড়া আকাঙক্ষা বৃদ্ধি করা, যাতে সত্য সত্যই সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ওঠে দেশটিতে।

এই রাজ্যের সিপিএম গোড়ার দিকে এটা করার চেষ্টাই করতো, যে জন্য একটার পর একটা নির্বাচনে বামফ্রন্টকেই ফিরিয়ে আনতেন ভোটদাতারা। ঠিক কী কী তাঁরা করতেন, যেটা পরে আর তাঁরা ধরে রাখলেন না, সেগুলির আলোচনায়ও আসবো। তবে এই প্রবন্ধে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো না। আমাদের বলার কথা এটাই যে, কালক্রমে দলটির মধ্যেই পরিবর্তন আসতে লাগলো। আসার প্রেক্ষাপট তৈরি করলো সোভিয়েত ব্যবস্থার বিপর্যয়। পরিবর্তন আনার কাজটা করলো নয়া উদারবাদী মতাদর্শ। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থেকে গেছেন, পার্টির সেই সংসদীয় শাখার মাতব্বররা ক্রমশ এটা ভাবতে শুরু করলেন যে, সমাজতন্ত্রের অনেক দোষ আছে (যে কারণে সোভিয়েতে তা টিকলো না)। আর নয়া উদারবাদী মতাদর্শে অনেকগুলো ভালো দিক আছে যেটা তারা কাজে লাগাতে পারেন তাঁদের শাসন ক্ষমতা আরও দৃঢ়মূল করার কাজে। এই বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লবটি প্রথমে ঘটলো মস্তিষ্কে। তারপর এটাকে একটা 'লাইন' হিসেবে নিয়ে আসার কাজ শুরু হলো। কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিটব্যুরোতে এই লাইন পাশ করানো মুশকিল, সেটা এঁরা জানতেন। সুতরাং এঁরা সে লাইন ধরলেন না। তাঁরা রাজ্যের যাঁরা প্রধান নেতা, যাঁদের জোরে ভোটে জেতে পার্টি, তাঁদের ধরতে শুরু করলেন প্রথমে। তারপর এই লাইন থেকে যা আসা সম্ভব, সেই নয়া উদারবাদী উন্নয়নের লাইন তাঁরা নিয়ে এলেন একটা থিসিস হিসেবে। ২০০৬ সালের নির্বাচনের আগে রাজ্যের পার্টির প্লেনাম করে এঁরা অনুমোদন করালেন এই লাইনটি— যা তাঁরা রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন। ২০০৬ সালের নির্বাচনে বিপুল জয়লাভ তাঁদের সাহসী করলো এইরকম একটা বাম রাজ্যে নয়া উদারবাদী সংস্কারের লাইন কার্যকর করতে। কৃষি, শিল্প, সরকারি পরিষেবা— সর্বত্র তাঁরা বেসরকারি পুঁজি-কর্পোরেট পুঁজির আক্রমণের পথ খুলে দিলেন। যাঁরা এ লাইন অনুমোদন করলেন না, কোটারির কেন্দ্রিকতা প্রয়োগ করে তাঁদের এঁরা চুপ করিয়ে দিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে লাইনটি বিরোধিতার সম্মুখীন হলো নানা সময়ে নানাভাবে। সেগুলো তাঁরা পাশ কাটাবার ব্যবস্থা করলেন নানা কৌশলে। এঁদের ধারণা ছিলো, এভাবেই ওঁরা পাঁচ বছর কাটিয়ে ২০১১ সালের নির্বাচনে আবার জয়লাভ করে লাইনটিকে কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।

বলা বাহুল্য, সেটা ঘটলো না। সেটা ঘটা সম্ভবও ছিলো না। কারণ এ রাজ্যের বামপন্থী মানুষ নয়া উদারবাদী সংস্কার আনার জন্য কোনো বামপন্থীকেই চায় না, সেটার জন্য তাঁরা আনবেন নরেন্দ্র মোদীর মতো কাউকে। এ রাজ্যের মানুষ বামপন্থীদের বামপন্থী হিসেবেই দেখতে চান। সে পথ তাঁরা ত্যাগ করলে তাঁরা খুঁজবেন এমন একটি দলকে যে দলটি বামদের ফেলে আসা লাইনেই কথা বলেন। ২০০৬ সালের নির্বাচনে পর্যুদস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা বুঝলেন এবং 'মা-মাটি-মানুষ'-এর কথা বলে জোটাতে শুরু করলেন সাধারণ মানুষকে। পেলেন আশাতীত সাফল্য। কোণঠাসা হলেন নয়া উদারবাদী বামপন্থীরা। একই ঘটনা ঘটতে পারতো কেরালার ক্ষেত্রেও যদি সেখানে পার্টির মধ্যে বিজয়নপন্থীরা এরকম একটা প্রতিবিপ্লব ঘটাতে পারতো। সেখানে এটা ঘটেনি কারণ সেখানকার বামপন্থীরা বিপুল সংখ্যায় জড়ো হলেন অচ্যুতানন্দ-এর সমর্থনে, যে অচ্যুতানন্দন সাবেকি মার্কসবাদের লাইনই ধরে রাখতে পারলেন সরকারি ক্ষমতায় আসীন থেকেই।

কেরালায় কেন এটা পারা গেল এবং একই পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখায় কেন এটা পারা গেল না, সেটা আলোচনা করা দরকার। সে আলোচনা করতে হলে অঙ্গরাজ্য সরকার গড়ার লাইনের অনুশীলন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকেও আলোচনায় আনতে হবে। কিন্তু লোকের মস্তিষ্কে প্রতিবিপ্লব এলেই এটা ঘটে না, এটা ঘটতে হলে প্রয়োজন হয় একটি অনুকূল পরিস্থিতিরও। পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতি এই নয়া উদারবাদী প্রতিবিপ্লবের অনুকূল হয়ে উঠেছিল। কীভাবে তা হয়ে উঠেছিলো তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তবে সেটা হবে অন্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের হাল-হকিকৎ

দেবাশিস ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের এই ফল কি প্রত্যাশিত? আমার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। আমি কলকাতা টিভি চ্যানেলে ২৯৪ কেন্দ্র ধরে ধরে বলেছিলাম বামফ্রন্ট ৬০টি আসন পাবে। সিপিআইএম নেতারা নিশ্চিত ছিলেন যে, ১৬০-১৭০ আসন বামফ্রন্ট পাবে। ভোটের ফল বেরুনোর আগের দিন ১২ মে বিকেলে বিমান বসু বলেছিলেন বামফ্রন্ট ১৯৯ আসন পাবে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নন্দনের অধিকর্তাকে ৯ মে বলেছিলেন ১৩ মে সন্ধ্যেবেলা এসে ছবি দেখবেন। জেলা কমিটির পাঠানো রিপোর্ট পড়ে সেগুলো যোগ করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ধারণা ছিল বামফ্রন্ট ১৭০ আসন পাবেই। ২০০৮ সালের মে মাসে পঞ্চায়েত ভোটের ফল বেরুনোর পর দুপুরে বিনয় কোঙার বলেছিলেন, সকালেও জানতাম দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ বামফ্রন্ট পাবে। জেলা পার্টি তেমন রিপোর্ট দিয়েছিল, ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের ধারণা ছিল কম করে হলেও বামফ্রন্ট ৪২টির মধ্যে ৩২টিতে জিতবে। কেউ কেউ দক্ষিণ কলকাতায় মমতা ব্যানার্জির জয় নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। ২০০৯ সালের ১৬মে লোকসভা ভোটের ফল দেখে নেতাদের চক্ষু বুজে গেল, কথা বন্ধ হয়ে গেল। ৪২টির মধ্যে বামফ্রন্ট পেল ১৫। এরমধ্যে সিপিআইএম ৯, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি ২টি করে মোট ৬টি আসন পেল। সেবারও জেলা পার্টির দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে নেতারা তেমন হিসেব ভেবেছিলেন। ২০১০ সালের ৩১মে কলকাতা ও চন্দননগর কর্পোরেশন সহ ৮১টি পুরসভার ১৭৮১টি ওয়ার্ডে পুরভোট হয়। যদিও সেই ভোটে ভোটার সংখ্যা ছিল মোট ভোটারের ১৭ শতাংশ। সেবারেও জেলা পার্টি বলেছিল ৮১টির মধ্যে অর্ধেকের বেশি বামফ্রন্ট পাবে। কলকাতা কর্পোরেশন হাত ছাড়া হলেও বামফ্রন্ট ৬১ ওয়ার্ড জিতবে। বামফ্রন্ট ১৮টি পুরসভা পেয়েছিল। ২০০৫ সালে ৮১টির মধ্যে বামফ্রন্ট জিতেছিল ৫৩টি পুরসভা। কলকাতা বামফ্রন্ট ৩৩ ওয়ার্ডে জিতেছে। বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ সালে পরপর তিন বছর ঠকেও এবার জেলা পার্টির রিপোর্টকে ভিত্তি করেছিলেন। যার ভিত্তিতে গৌতম দেব বলেছিলেন, "অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার হবেই। ১৩ মে বিকেল সাড়ে তিনটের সময় মমতাকে ফোন করে বলবো, তুমি রেলমন্ত্রী থাকো। বামফ্রন্ট সরকার তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। আর বুদ্ধদাকে বলবো, মমতার বাড়ির পাশে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। বলা যায় না, মমতা তখন কী করে বসে। সেই গৌতম দেবের মুখ বন্ধ।

এই লেখায় দুটি বিষয়ে আলোচনা করবো— (১) ভোটের ফল কী বলছে অর্থাৎ এই ফলের রাজনৈতিক তাৎপর্য কী? (২) সিপিএম-এর হারের মূল উৎসটা কোথায়?

ভোটের ফলের বিশ্লেষণ

১৮ এপ্রিল প্রথম পর্বে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনে ভোট হয়েছে। আগে উত্তরবঙ্গে ছিল ৪৯টি আসন। ডিলিমিটেশনের পরে আসন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪। উত্তরবঙ্গে ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ১টি আসন পেয়েছিল— দিনহাটা। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের ফলও বলছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর ছাড়া বাকি ৪টি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস ছিল দুর্বল। মুসলিম অধ্যুষিত মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল। সিপিএম সব জেলাতেই শক্তিশালী ছিল। ফরওয়ার্ড ব্লক কোচবিহার, আরএসপি জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ার মহকুমা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে শক্তিশালী ছিল। ছিল মানে এখন নেই, তা নয়। তবে স্বাভাবিকভাবে শক্তি কমেছে। বামফ্রন্টের শক্তি কমেছে, তাহলে কার শক্তি বৃদ্ধি হলো? তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্যই কংগ্রেসের। উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা কমিটির সম্পাদক সিপিএম রাজ্য-নেতৃত্বকে যা জানিয়েছিল তা যোগ করলে দাঁড়ায় বামফ্রন্ট কম করে ৪০টি পাবে। অশোক ভট্টাচার্য তাই বলেছিলেন। পাঠকদের মনে করিয়ে দিই, প্রথম পর্বের প্রচার শেষে বীরভূম হয়ে মুর্শিদাবাদ গিয়ে ১৭ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন উত্তরবঙ্গে ৫৪টির মধ্যে বামফ্রন্ট ১০টি পাবে। কী ফল হয়েছে? বামফ্রন্ট পেয়েছে ১৪, কংগ্রেস ১৭, তৃণমূল কংগ্রেস ১৬, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ০৩, নির্দল ২। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার অন্যবারের তুলনায় অনেক পরিকল্পিত ও সংগঠিত প্রচার করেছেন। তিনি দেখেছেন কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস হেরেছিল মাত্র ৩৩৭৪৯ ভোটে। অথচ ওখানে বিজেপি, বিএসপি, আমরা বাঙালি, ভারতের রিপাবলিকান পার্টি ও চারজন নির্দল প্রার্থী মিলে ভোট পেয়েছিল ১,৫৩,৪৩৮ ভোট। বিজেপি, বিএসপি-র মত সর্বভারতীয় স্বীকৃত দল বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে দাঁড়াবে ও ভোট পাবে সেটা সহজেই বোঝা যায়। অন্যদেরও নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার আছে। তা বলে অন্যরা এত ভোট টানবে? বালুরঘাট লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস হেরেছিল মাত্র ৫১০৫ ভোটে। সেখানে বিজেপি, বিএসপি, সংযুক্ত আসাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা ও দু'জন নির্দল প্রার্থী মিলে পেয়েছিলেন ১,০৩,৫৭৭। ভাবুন, বালুরঘাটে লড়ছে আসাম সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা। এজন্যই মমতা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ব্যানার্জি এবার উত্তরবঙ্গের প্রচারে নির্দল ও অন্যদের ভোট দেওয়ার অর্থ বোঝান। তিনি বলেন, এঁদের যারা ভোট দেন তাঁরা মূলত সিপিএম বিরোধী। কিন্তু সিপিএম বিরোধী ভোট ভাগ হওয়াতেই সিপিএম লাভবান হয়।

বিধানসভা ভোটের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে মেরুকরণ ততটা তীব্র হয়নি। বিজেপি, বিএসপি, অন্যান্য দল ও নিদর্লরা অনেক ভোট পেয়েছে। এটা ঠিক এই ভোট মূলত সিপিএম বিরোধী। লোকসভা ভোটে সারা রাজ্যে জোট পেয়েছিল ৪৬ শতাংশ ভোট। বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৪৩ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ দুটো বড়ো পক্ষ মিলে পেয়েছিল ৮৯ শতাংশ ভোট। অন্যান্যরা পেয়েছিল ১১ শতাংশ ভোট। অথচ বিধানসভা ভোটে কোচবিহারে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৪৫.৪৩%, কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট ৩৯.১৪%, অন্যান্যরা ১৫.৪৪%। জলপাইগুড়িতে ফ্রন্ট ৩৯.৪৯%, জোট ৩৮.৪৫%, অন্যান্যরা ২২%। এখানে কালচিনিতে নির্দল প্রার্থী জিতেছেন। দার্জিলিং-এ ফ্রন্ট ১৮.৫৪%, জোট ২৪.৪৪%, অন্যরা ৫২.৪১%। অবশ্য এই জেলায় অন্যদের মধ্যে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা আছে। উত্তর দিনাজপুরে ফ্রন্ট ৪১.৬৫%, জোট ৩৬.২৫%, অন্যান্য ২২%। এই জেলার চোপড়া আসনে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে জিতেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুরে ফ্রন্ট ৪২.৮৬%, জোট ৪৮.৩৯%, অন্যরা ৮.৭৬%। মালদহে ফ্রন্ট ৪০.৮৪%, জোট ৪৩.৭৬, অন্যরা পেয়েছেন ১৫.৩৪% ভোট।

এই ভোটের ফল বলছে আগামী দিনে বামফ্রন্ট আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও বালুরঘাট লোকসভা আসনে হারবে। কোচবিহার লোকসভা আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, ফল অনিশ্চিত।

দ্বিতীয় পর্বে ২৩ এপ্রিল ভোট হয় মুর্শিদাবাদের ২২, নদীয়ার ১৭, বীরভূমের ১১— এই ৫০ আসনে। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস শক্তিশালী, তৃণমূল কংগ্রেস দুর্বল। তৃণমূল কংগ্রেস ৪টি আসনে লড়ে। সেই ৪টি আসনে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী গোঁজ প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দেয়। এই ৪ জন গোঁজের একজনও জেতেনি। তবে ৩টি আসনে তারা বামফ্রন্টকে জিততে সাহায্য করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস ১টি আসন সাগরদিঘিতে জেতে। মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেস পা রাখে। বামফ্রন্ট ৭টি আসন পায়। কংগ্রেস ১৪টি আসন পায়। কংগ্রেসের গোঁজ প্রার্থী না থাকলে বামফ্রন্ট ৭টি আসনও পেত না। হরিহরপাড়ায় সিপিএম জিতেছে ৬৩৫৮ ভোটের ব্যবধানে মাত্র ৩৫.৫৬% ভোট পেয়ে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে অধীর চৌধুরীর গোঁজ প্রার্থী মীর আলমগীর এখানে পেয়েছেন ৪৪৯৮২ ভোট। ভগবানগোলায় বামফ্রন্টের সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী ১৩৩৩৪ ভোটে জেতেন। অথচ এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে অধীর চৌধুরীর গোঁজ প্রার্থী পেয়েছে ৪০৩৭৬ ভোট। গোঁজ প্রার্থী না থাকলে মুর্শিদাবাদ বামফ্রন্ট ৫টি আসনে জিততো। এই জেলায় ফ্রন্ট পেয়েছে ৪১.৬৮% ভোট, জোট ৪৪.৩৯%, অন্যরা পেয়েছে ১৩.৯৩% ভোট।

নদীয়ার ১৭টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট জিতেছে ৩টি, জোট ১৪টি। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ১৩টি। কংগ্রেস জিতেছে শান্তিপুরে, নদীয়ায় ফ্রন্ট ভোট পেয়েছে ৩৯.৮১%, জোট ৪৭.৭৫%, অন্যরা ১২.৪৪%। ২০০১ সালে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস যখন জোট হয়েছিল তখন নদীয়ার ফ্রন্ট পেয়েছিল ৪১% ভোট। নদীয়ায় বামফ্রন্টের অবস্থা বহু বছর ধরেই খারাপ। তেহট্টতে সিপিএম জিতেছে ২১১৯৭ ভোটে। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌরীশঙ্কর দত্ত তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। গোঁজের নির্দল প্রার্থী তাপস সাহা ৫৬২৪৮ ভোট পেয়েছেন।

বীরভূমে ১১টি আসন আছে। এক নম্বর পরিবর্তন ইস্যু তো ছিলই, তার সঙ্গে এবার বীরভূমে যুক্ত হয়েছে নানুরের সূচপুরের গণহত্যার বিচারে সিপিএম নেতাদের কারাদণ্ড। বীরভূমে ৮টি আসনে জিতেছে জোট, ৩টি আসনে জিতেছে বামফ্রন্ট। দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া ও ময়ূরেশ্বরে বামফ্রন্ট জিতেছে বিজেপি-র জন্য। ময়ূরেশ্বরে বামফ্রন্ট জিতেছে ৬৫২০ ভোটে। বিজেপি পেয়েছে ৩১,০৩১ ভোটে। এই জেলায় ফ্রন্ট পেয়েছে ৪২.২৭% ভোট, জোট ৪৭.০৬%, অন্যান্যরা ১০.৬৭%।

তৃতীয় পর্বে ভোট হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ৩৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১ এবং কলকাতার ১১টি আসনে। এই তিনটি জেলায় লোকসভা আসন আছে ১১টি। ১১টি আসনেই লোকসভা ভোটে জোট চুটিয়ে জিতেছিল। এবারের বিধানসভা ভোটের ফল কী বলছে? উত্তর ২৪ পরগণার গঙ্গার ধারে ব্যারাকপুর মহকুমার বীজপুর থেকে বরাহনগর সব কটি আসনে বামফ্রন্ট হেরেছে। সল্টলেক, বারাসাত, বনগাঁ মহকুমার সবকটি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে। এর মধ্যে তফশিলি সংরক্ষিত আসনও আছে। একমাত্র বসিরহাট মহকুমায় বামফ্রন্ট কিছুটা ভাল ফল করেছে। সন্দেশখালি, বসিরহাট (দক্ষিণ), বসিরহাট (উত্তর), হিঙ্গলগঞ্জে বামফ্রন্ট জিতেছে। লোকসভা ভোটে বসিরহাট লোকসভা আসনের অন্তর্গত সন্দেশখালিতে বামফ্রন্টের সিপিআই প্রার্থী অজয় চক্রবর্তী মাত্র ৫৫০ ভোটে পিছিয়ে ছিলেন। এখানে বিধানসভা ভোটে বিজেপি ১৭৪২৫ ভোট পেয়েছে। এখানে বিজেপি-র শক্তি আছে। বসিরহাট (দক্ষিণ) কেন্দ্রে বামফ্রন্ট লোকসভা ভোটে ২০৩২৬ ভোটে পিছিয়ে ছিল। সেই আসন জিতল কী করে? এখানে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মজুমদার গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে ৫২৪৮৪ ভোট পান। জোটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পান ৫৪৫১৪ ভোট।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

দুটো যোগ হলে বামফ্রন্ট প্রার্থী ৪০ হাজার ভোটে হারত। ভোট ভাগ হওয়ায় বামফ্রন্ট প্রার্থী ১২৪০০ ভোটে জিতেছেন। বসিরহাট (উত্তর) কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন ২৯মে 'আত্মহত্যাকারী' সিপিআইএম প্রার্থী মুস্তাফা বিন কাশেম। তিনি জিতেছিলেন ৩৯৪৩ ভোটে। লোকসভায় এই আসনে বামফ্রন্ট ১৭৩১০ ভোটে পিছিয়ে ছিল। নিশ্চিত জয় বুঝে এখানে তৃণমূল প্রার্থী কংগ্রেস করেছিল সর্দার আমজাদ আলির মত ব্যক্তিকে। এখানে বিজেপি ও পিডিসিআই অনেকটা ভোট পেয়ে বামফ্রন্টকে জিততে সুবিধে করে দিয়েছে।

হিঙ্গলগঞ্জে লোকসভা ভোটের সময় বামফ্রন্ট ১৭৭৪ ভোটে এগিয়ে ছিল। ভাল আসন বুঝেও সিপিআইএম এই আসনটি সিপিআইকে ছাড়ে। সিপিআই ১০১৫ ভোটে জেতে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা নিয়ে আলোচনা করা যাক। সিপিআইএম নেতৃত্ব ধারণা করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত জেলা পরিষদের অপদার্থতা বিধানসভা ভোটে প্রতিফলিত হবে। তা হয়নি। বরং স্বয়ং (প্রাক্তন) মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি হেরেছেন। জেলার অন্য দুই মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা ও সুভাষ নস্কর জিতেছেন। এই জেলাতে ৩১টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট বাসন্তী, ক্যানিং (পূর্ব), কুলতলী ও ভাঙর এই ৪টি আসনে জিতেছে। সিপিআইএম-এর জেলা নেতৃত্বের ধারণা ছিল এই ৪টি আসনের সঙ্গে যাদবপুর, রায়দীঘি, কাকদ্বীপ, টালিগঞ্জ ও মেটিয়াবুরুজ নিয়ে অন্তত ৯টি আসনে জেতা যাবে। দলের ধারণা ছিল উন্নয়ন করেছেন বলে কান্তি গাঙ্গুলি জিতবেন। পোশাক শিল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ১০ শতাংশ কর চাপানোয় দর্জি শিল্পীরা জোট প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে মেটিয়াবুরুজে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে জেতাবেন। তাছাড়া, বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থী খালেক মোল্লা বামফ্রন্টের জয়ের পথ সুগম করবে। কিন্তু দেখা গেল বামফ্রন্ট পেল মাত্র ৩৬.৫৮ শতাংশ ভোট। খালেক মোল্লা খারাপ ভোট পাননি, ১৮.২৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মমতাজ বেগম ৪১.৬ শতাংশ ভোটে পেয়ে জেতেন। একে পরিবর্তনের হাওয়া, দ্বিতীয়ত মমতাজ বেগম খুবই ভালো প্রার্থী। আবার ভাঙরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আরাবুল ইসলামের নামে কিছু অভিযোগ থাকায় পরিবর্তনের হাওয়া সত্ত্বেও ওই আসনে তৃণমূল কংগ্রেস হারে। এই জেলার আশ্চর্যজনক ফল তিনটি— (১) যাদবপুরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পরাজয়, (২) রায়দীঘিতে কান্তি গাঙ্গুলির পরাজয়, (৩) কুলতলীতে এসইউসি-র পরাজয় ও সিপিএম-এর জয়। লোকসভা ভোটেও যাদবপুরে বামফ্রন্ট ১৯০৭৭ ভোটে এগিয়ে ছিল। এক বছর পর পুরসভা ভোটের ফল যোগ করলে বামফ্রন্ট পিছিয়ে ছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হারেন ১৬৬৮৪ ভোটে। ২০০৬ সালে জিতেছিলেন ৫৮ হাজার ভোটে। যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র ১৯৬৭ সালে তৈরি হয়। তারপর একটানা ১১বার এখানে সিপিএম জিতেছে। ১৯৬৭ সালে জিতেছিলেন বিকাশ গুহ। ১৯৭১ সালে দীনেশ মজুমদার। এমনকি ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ হওয়া সেই নির্বাচনেও সিপিএম জিতেছিল। ১৯৮২ সালে জেতেন শঙ্কর গুপ্ত। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। উপনির্বাচনে জেতেন ড. অশোক মিত্র। ১৯৮৭ সাল থেকে জিতছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ১৯৮৭ সালে সিপিএম এখানে পেয়েছিল ৬৩.৮০ শতাংশ ভোট। এবার সেটা কমে হয়েছে ৪৪.২৪ শতাংশ। ২০০১ সালে এই কেন্দ্রে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মাধবী মুখার্জীকে হারিয়েছিলেন ২৯২৮১ ভোটে। তখন সদ্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটা আকর্ষণ ছিল। ২০০৬ সালে ৫৮ হাজার ভোটে জেতার মধ্যে বেশ কিছুটা জল, মানে কারচুপি, ছিল। তখন তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ, ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে বিপর্যয় হয়েছে। সেই সুযোগে সিপিআইএম-এর জোনাল কমিটির মাতব্বর ও অসৎ নেতারা বহু লোককে ভোট দিতে না দিয়ে তাদের ভোট দিয়ে দিয়েছিল। এই আলোচনায় আমরা পরে আসব।

কলকাতার ১১টি আসনের মধ্যে সিপিএম-এর আশা ছিল বেলেঘাটা, শ্যামপুকুর, এন্টালি জিততে পারবে। এজন্য বেলেঘাটায় মানব মুখার্জিকে সরিয়ে অনাদি সাহু এবং এন্টালিতে দেবেশ দাসকে প্রার্থী করা হয়। এটা ঠিক কলকাতার বাকি ৮টি লোকসভা কেন্দ্রের তুলনায় এই ৩টি কেন্দ্রেও বামফ্রন্ট হারলেও কম ভোটে হেরেছিল। কিন্তু সিপিএম-এর ঘুরে দাঁড়ানোর লাইনকে অগ্রাহ্য করে ভোটররা এইসব কেন্দ্রেও বিপুল ভোটে বামফ্রন্টকে হারায়। লোকসভা ভোটে এন্টালি বিধানসভা অংশে সিপিএম প্রার্থী মহঃ সেলিম ৫৯৪০ ভোটে হেরেছিলেন। বিধানসভা ভোটে দেবেশ দাস হারলেন ২৪৯৯৬ ভোটে। বেলেঘাটায় সেলিম হেরেছিলেন ৬৯৫৭ ভোটে। এবার অনাদি সাহু হারলেন ৩১৬৮৮ ভোটে। শ্যামপুকুরে সেলিম হেরেছিলেন ৯৩২২ ভোটে। এবার সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের জীবন সাহা হারলেন ২৭০৩৬ ভোটে। বেলেঘাটা, শ্যামপুকুরে ২০০১ ও ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট জিতলেও তাতে প্রচুর জল ঢালা হয়েছিল।

কলকাতা পেরিয়ে হাওড়া। লোকসভা ভোটের নিরিখে হাওড়ার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বামফ্রন্ট বালী ও হাওড়া (উত্তর) কেন্দ্রে এগিয়েছিলেন। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে বামফ্রন্ট জোর ধাক্কা খায়। হাওড়া জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বামফ্রন্ট মাত্র ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সেই অনুযায়ী লোকসভার দুটো আসনেই হেরেছিল। এবার তৃণমূল কংগ্রেস হাওড়া (উত্তর) কেন্দ্রে প্রাক্তন বিধায়ক অশোক ঘোষকে প্রার্থী করায় বোঝা গিয়েছিল, পরিবর্তনের হাওয়া ও অশোক ঘোষের অভিজ্ঞতার

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

জোরে এই আসনে বামফ্রন্ট এবার হারবে। কিন্তু লোকসভা ভোটে ৬১ শতাংশ ভোট পাওয়া বালীতে বামফ্রন্ট হারবে ভাবতে পারিনি। বিধানসভা ভোটে বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছে ৪৪.১১ শতাংশ। ১৭ শতাংশ ভোট কমেছে। যতই পরিবর্তনের হাওয়া থাক, এতটা কমা অস্বাভাবিক। আসলে ওই ৬১ শতাংশে ১০-১২ শতাংশ জল ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দারুণ প্রার্থীকে ওখানে দাঁড় করিয়েছিলেন। মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, ১৯৯৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ স্টেশনে গুলিচালনার নায়ক সুলতান সিংয়ের নামে আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু মনে হয় এমন প্রার্থী ছাড়া সিপিএম-এর জল ঢালা বন্ধ করা যেত না। নির্বাচন কমিশন এবার খুবই কড়াকড়ি করেছে, তথাপি হয়ত সম্ভব হতো না। সুলতান সিং পুলিশে তাঁর যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে সিপিএম-এর মেশিনারি ভোঁতা করে দিয়েছেন। পতিতপাবন পাঠক বেঁচে থাকলে কাঁদতেন এই দেখে যে, বালী চলে গেল সুলতানের হাতে।

সিপিএম-এর আর একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল হুগলী জেলা। সেই জেলায় শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া সদরে সিপিএম আগেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ধনেখালি, হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, খানাকুল, আরামবাগ, গোঘাট ও জাঙ্গিপাড়া এই ৮টি আসন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। জানতাম, গোঘাট ছাড়া সবকটি আসনেই এবার বামফ্রন্ট হারবে। কারণ, (১) প্রতি ভোটে অন্যসব কেন্দ্রের মত এইসব কেন্দ্রেও বামফ্রন্টের শতাংশ ভোট কমছে। এটা ঠিক, ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার, অপারেশন, বর্গা, পঞ্চায়েতি রাজ চালু করায় ১৯৮২ সালে তার ভোট বৃদ্ধি হয়। আর একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়, ১৯৭৭ সালের তুলনায় ১৯৮২ সালে ভোটদানের হার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, ১৯৭৮ সালের ৪ জুন পঞ্চায়েত ভোটের পর বাংলার সব গ্রামে সিপিএম-এর সংগঠন শক্তিশালী হয়। সেই সংগঠনের সুবাদে সংগঠনের তাড়ায় দলে দলে গ্রামের গরিবরা ভোট দিতে যান এবং বামফ্রন্টকে ভোট দেন। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অজ গাঁয়ের মানুষ ভোটদানে এত উৎসাহী ছিলেন না। বামফ্রন্ট সরকারের ভালো কাজের জন্য ১৯৮৭ সালে বামফ্রন্টের ভোট ৫৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। আরামবাগের ওই আসনগুলোয় তখনই ভোট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকেই বহু গ্রামের আসনে বামফ্রন্টের ভোট কমতে থাকে। কিন্তু আরামবাগ মহকুমার আসনগুলোয় তা হয় না। সেখানে সিপিএমের গুণ্ডারা ভোটে রিগ করতো। এবার সেটা করা যায়নি। কারণ নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি। এবং যেখানে সিপিএমের গুণ্ডা সংখ্যায় বেশি, সেখানে মমতা ব্যানার্জি বুনো ওলের ওষুধ হিসেবে সব বাঘা তেঁতুল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বালীতে সুলতান সিং যেমনি সফল হয়েছেন, তেমনি তারকেশ্বরে রচপাল সিং সফল হয়েছেন। খানাকুলে মমতা ব্যানার্জী দলের একজন বাঘা তেঁতুল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রার্থীর নাম আর হাঁকডাক শুনেই সিপিএম গুণ্ডাদের পিলে চমকে গিয়েছিল। তাই ওই ৮টির মধ্যে ৭টি তৃণমূল কংগ্রেস জেতে। একমাত্র গোঘাটে বামফ্রন্ট জেতে। গোঘাটে লোকসভাতেও বামফ্রন্ট ৬০৭৪৩ ভোটে জিতেছিল। এবার জিতেছে মাত্র ৪২৬৫ ভোটে। একশো শতাংশ খাঁটি জলহীন ভোটের ফল। লোকসভা ভোটে এখন ভোট হলে গোঘাট সহ বামফ্রন্টের জেতা ৯৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অনেকগুলি জিততে পারত না। এর ফলে লোকসভায় বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট ৪৩ শতাংশের বদলে ৪২ শতাংশ ও জোটের ভোট ৪৬ শতাংশের বদলে ৪৭ শতাংশ হতো।

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। ২০০১ সালে এম এস গিলের পরিবর্তে এই কুরেশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার থাকলে সেবার বামফ্রন্ট ১৯৯ আসন পেত কি না, তা নিয়ে এখন আলোচনা হওয়া উচিত। ১৯৮৯ সালের লোকসভা ভোট পর্যন্ত সিপিএম অবাধ ভোটে বিশ্বাস করতো। ১৯৯০ সালের ১৭ জুন কলকাতা পুরসভা ভোটে ব্যাপক রিগিং করে বামফ্রন্ট ১৪১ ওয়ার্ডের মধ্যে ৯৪টিতে জেতে। ১৯৯১ সালের ২০ মে একসঙ্গে হওয়া লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে সিপিএম গ্রাম ও শহরে রিগিং করে। কলকাতায় বহু সুউচ্চ আবাসনের গেটে তালা মেরে দেয়। ১৯৭২ সালের কংগ্রেসি গুন্ডাদের মতোই সিপিএমের কর্মীরা অন্যদের ভোট দিয়ে দেয়। বহু ভোটার বুথে দিয়ে শোনেন তাঁদের ভোট পড়ে গেছে। ১৯৭৭-১৯৮৯ এই ১৩ বছরে সিপিএমের সাদা দিক দেখা যায়। মরিচঝাঁপি, বিজন সেতু সহ বেশ কিছু জায়গায় মানবাধিকার হরণের ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর থেকে সিপিএম-এর চেহারা পাল্টাতে থাকে। এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

এখন আমরা আসি পূর্ব মেদিনীপুরের কথায়। লোকসভা ভোটের ফল অনুযায়ী সবাই জানতেন এই জেলার ১৬টি আসনেই বামফ্রন্ট হারবে। নন্দীগ্রাম কাণ্ড সিপিএম-এর বুকে শেল বিঁধে দিয়েছে। নন্দীগ্রামে ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট জিতেছিল, এবার ভোট পেয়েছে মাত্র ৩৪.৭৫ শতাংশ। মহিষাদলে লক্ষণ শেঠজির স্ত্রী কবি তমালিকা পণ্ডা শেঠ ভোট পেয়েছেন ৩৯ শতাংশ। হলদিয়ায় সিপিএম নেতা নিত্যানন্দ বেরা ভোট পেয়েছেন ৪৪.৫ শতাংশ। খেজুরিতে বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছে ৪৩.৩৪ শতাংশ। তমলুকে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৪১.৮৮ শতাংশ।

এবার আসা যাক পশ্চিম মেদিনীপুরে। এই জেলায় লোকসভা ভোটে মোট ৩টি আসনই বামফ্রন্ট পেয়েছে। এখানে সিপিএমের সংগঠন খুবই শক্তিশালী ছিল। আবার এটাও ঠিক এই জেলার কেশপুর, গড়বেতা (পূর্ব), গড়বেতা (পশ্চিম), শালবনী, মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটি আসনে সিপিএম কর্মীরা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

তেড়ে জল ঢালতো। ২০০১ সালে কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী নন্দরানী দল ১ লক্ষ ৮ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। এবার সেই আসনে সিপিএম জিতেছে কিন্তু ৩৩৮৪২ ভোটে। লোকসভা ভোটের সময় ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অধীন এই বিধানসভা অংশে সিপিআই প্রার্থী গুরুদাস দাশগুপ্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন। বুঝুন একবার, ৭০-৮০ হাজার ভোট জল হয়ে মিশে যাচ্ছে। এবার নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ির জন্য সিপিএম জল ঢালতে পারেনি। সেজন্য রাজ্য কমিটিতে পাঠানো জেলা কমিটির অতিরঞ্জিত রিপোর্ট মেলেনি। যে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট দেখে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিশ্চিত ছিলেন যে, বামফ্রন্ট অন্তত ১৬০টি আসন পাবে। সেজন্য বুদ্ধদেববাবু ৯ মে রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন নন্দনে গিয়ে অধিকর্তাকে বলে এসেছিলেন ১৩ মে সন্ধ্যেবেলা এসে সিনেমা দেখবেন। ১২ মে বিকেলে রাজ্য দপ্তরে সিপিএম নেতারা আলোচনা করেন নতুন বিধানসভায় বামফ্রন্টের স্পিকার কে হবেন? কারণ হাসিম আবদুল হালিম ভোটে দাঁড়ান নি। জেলা কমিটির নেতারা রাজ্য নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁদের মনোমত রিপোর্ট দিয়েছেন। ভেবেছিলেন রিগ করে এবং তালেগোলে মিলে গেলে নেতারা রাজ্য কমিটি, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী, কেন্দ্রীয় কমিটিতে যাবেন। যাইহোক, সেসব আর হলো না। এটা ঠিক, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় আদিবাসী সংরক্ষিত আসনগুলি ১৯৮২ সাল থেকে একটানা বামফ্রন্ট জিতছিল। এবার সেইসব আসনেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। এর কারণ— (১) নেতাই গণহত্যা, (২) ২০০৯ সালের ১৮ জুন থেকে ২২ মাস ধরে চলা যৌথবাহিনীর অত্যাচার দমন পীড়ন। এটা অস্বীকার করা যাবে না, যে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার আদিবাসী এলাকার উন্নয়নে কিছু কাজ করেছিল। তারপর ১৯৯১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা আসে। তখন সিপিএমের পঞ্চায়েতের মোড়লরা চুরি করতে থাকে। জনগণ বোঝেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা চুরি হচ্ছে। ১০০ টাকা এলে ৬০-৬৫ টাকার কাজ হচ্ছে, ৩৫-৪০ টাকা চুরি হচ্ছে। এজন্যই সিপিএমের শাখা, লোকাল ও জোনাল কমিটির নেতারা জনগণের বিরাগভাজন হন। সুযোগ বুঝে জনতা এবার ভোটে সিপিএমকে শিক্ষা দিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৯টি আসন আছে। এবার বামফ্রন্ট দাঁতন, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, পিংলা, খড়গপুর, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, কেশপুর, বিনপুর— এই ৯টি আসন জিতেছে। সিপিএমের জেলা কমিটির হিসেব ছিল ন্যূনতম ১৬টি বামফ্রন্ট জিতবে। তাও দাঁতনে সিপিআই জিতেছে ৪৬৫৯ ভোটে। কেশিয়াড়িতে ১০৩৭, পিংলায় ১২৩৪, খড়গপুরে ২৫০৪, চন্দ্রকোণায় ১২৯৬ ভোটে বামফ্রন্ট জিতেছে। সিপিএমের অবস্থা কতটা খারাপ এ থেকে তা বোঝা যায়।

পুরুলিয়ায় ৯টি আসন আছে। প্রতিটি ভোটে বামফ্রন্ট অন্তত ৮টি জিততো। এবার জিতেছে মাত্র ২টি— বান্দোয়ান, জয়পুর। জয়পুরে বামফ্রন্ট জিতেছে ১০৬১১ ভোটে। সেখানে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থী শক্তিপদ মাহাতো ৫১৪৪৯ ভোট পেয়েছেন। সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি বলরামপুর, মানবাজার, কাশীপুর, পারা, রঘুনাথপুরে পতপত করে উড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা।

বাঁকুড়ায় আসন ১২টি। বিমান বসু ১২ মে বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন বাঁকুড়ায় ১২টি আসন বামফ্রন্ট পেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ১৩ মে সকাল ৯টায় টিভি দেখে বিমান বসু আঁতকে উঠলেন। বাঁকুড়ায় বামফ্রন্ট জিতেছে মাত্র ৩টি আসন। রানীবাঁধ, রায়পুর ও তালডাংরা। রায়পুরে জয় ১৮২ ভোটে। সোনামুখী, ইন্দাস, বিষ্ণুপুর, ওন্দা, বড়জোড়া, সালতোড়া, ছাতনার মত সিপিএমের শক্ত ঘাঁটিতে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এবার আসা যাক বর্ধমানে। বর্ধমানে ২৫টি আসন আছে। সিপিএমের জেলা কমিটির হিসেব ছিল অন্তত ১৮টি আসন জিতবে। জিতেছে ৯টি আসন। খণ্ডঘোষ, রায়না, মন্তেশ্বর, বর্ধমান (উত্তর), মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, গলসী, পাণ্ডবেশ্বর, জামুড়িয়া। মঙ্গলকোটে বামফ্রন্ট জিতেছে ১২৬ ভোটে, মন্তেশ্বরে ৩২৯৮ ভোটে। আসানসোল, দুর্গাপুরের মত শিল্পাঞ্চলের সব আসনে তৃণমূল কংগ্রেস হৈ হৈ করে জিতেছে। আবার গ্রামাঞ্চলেও জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই হিসেবে বর্ধমানের ৩টি লোকসভা আসনেই বামফ্রন্ট পিছিয়ে আছে।

রাজনৈতিক তাৎপর্য —

(১) সিপিএম তথা বামফ্রন্টের ভোটের হার ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকে ক্রমশই কমছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের হার।

(২) ২০০৬ সালের বিধানসভা, ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ও ২০০৯ সালের লোকসভা ভোট অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস ছিল নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম— মূলত দক্ষিণবঙ্গের এই ৮টি জেলার দল। বিধানসভা ভোটের ফল বলছে তৃণমূল কংগ্রেস এখন কোচবিহার থেকে পুরুলিয়া, ১৯টি জেলারই এক নম্বর দল।

(৩) কংগ্রেস কোনও দিন কৃষক আন্দোলন করেনি। কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস কৃষক আন্দোলন করে বাংলার কৃষকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। সিপিএমকে সরিয়ে কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক হয়েছেন। কারণ, প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সম্পাদক হলেন প্রাথমিক শিক্ষক, বেকার যুবক, হকার, ছোট দোকানদার। তাঁর পরিবারে হয়ত মাসে রোজগার বড়জোর ৭-৮ হাজার টাকা। বিপরীতে সিপিএমের লোকাল কমিটির

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

নেতাদের বাড়িতে চারটে খাওয়ার মুখ, গ্রামে বলে চারটে পাত পড়ে এবং রোজগারের সংখ্যা ২টি-৩টি। কেউ প্রাথমিক শিক্ষক, কেউ সরকারি কোনও দপ্তরের চাকুরে। মাসে সেই পরিবারের রোজগার ৪০-৪৫ হাজার টাকা এবং আরও আছে। সিপিএমের স্থানীয় নেতারা পঞ্চায়েত নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করে। সিপিএম সদস্যদের হয়ত ৬০ শতাংশের বাড়িতে মোটরবাইক আছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ শতাংশ পরিবারে মোটরবাইক আছে।

কলকাতা ও হাওড়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পদযাত্রার প্রতিযোগিতা হয়েছে। পদযাত্রার প্রতিযোগিতা বলা ঠিক হবে না। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিন ৫-৬ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটেছেন। অন্যদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য খোলা জিপে উঠে হাত নেড়ে গোলাপ ফুলের তোড়া নিয়েছেন। গোলপার্ক থেকে গড়িয়া, হাওড়া এই দুটি জায়গায় দু'জনেই তেমন পদযাত্রা ও জিপযাত্রা করেছেন। বুদ্ধদেববাবুর রোড শো-তে পঞ্চাশ হাজার সিপিএম সদস্য কর্মী সমর্থক জড়ো হয়েছিলেন। দলের জোনাল কমিটিগুলো সার্কুলার দিয়ে মিছিলকারীদের আসতে নির্দেশ দিয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের দেখে মনে হয়েছে, ৮০ শতাংশের পরিবারের রোজগার কম করে মাসে ৪০-৫০ হাজার টাকা হবে। কেউ অধ্যাপক, কেউ স্কুল শিক্ষক, ব্যাঙ্ক চাকুরে, সরকারি চাকুরে ইত্যাদি। বেশভূষাও ভাল ছিল। বেশিরভাগই এমএ পাশ। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন শুনে পিলপিল করে গরিব মানুষ ছুটেছেন। শ্রাবণ মাসে কাঁখে জল নিয়ে যে লাখো লাখো অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অল্পশিক্ষিত, অল্প রোজগেরে, খেটে-খাওয়া বস্তিবাসী নারী-পুরুষের দল তারকেশ্বরে যান তাঁরাই মমতার পদযাত্রায় হেঁটেছেন। এরা জড়ো হয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনও জোনাল কমিটির সার্কুলার পেয়ে নয়। প্রথম দলের সাথে দ্বিতীয় দলের মূল তফাৎটা তার ফলে দাঁড়িয়েছে সংগঠন বনাম স্বতঃস্ফূর্ততার। আর তাতে হার হয়েছে সংগঠনের— সিপিআইএম-এর প্রবল প্রতাপ সংগঠনও স্বতঃস্ফূর্ততার জোয়ারে ভেসে গেছে। আর পরাজয়ের মূল উৎস হিসেবে এক কথায় চিহ্নিত করা যায় চারটি বিষয়কে: (১) ব্যাপক জনবিচ্ছিন্নতা। নব্বইয়ের দশক থেকে সেটা ক্রমশ বাড়ছিল, ২০০৬-এর পর সেই বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছে গেছে। (২) এই বিচ্ছিন্নতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে সমস্ত জেলার তো বটেই, এমনকি তার নিচু তলার পার্টি অফিসগুলিরও কার্যত 'কর্পোরেট অফিসে' রূপান্তর। শুধু চাকচিক্যের বিচারেই নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণেও। ফলে মানুষ আর আগের মতো পার্টিকর্মীদের নিজেদের কাছের মানুষ বলে ভাবার অভ্যেসটাই হারিয়ে ফেলেছে।(৩) ভোটে কারচুপি করেই মূলত বামফ্রন্ট আগের সমস্ত নির্বাচনে জিতেছিল— একথা যেমন ঠিক নয়, ঠিক তেমনি অন্তত কিছু শতাংশ ভোট সেই সূত্র থেকেই আসছিল— একথা অস্বীকার করেও লাভ নেই। এবং সেটা ক্রমশ বাড়ছিল। এবার নিশ্চিত পরাজয়ের আশংকায় সেটার জন্য সবিশেষ প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের প্রচণ্ড কড়াকড়ি, এবং তার সাথে সাথে ব্যাপক মানুষের, বিশেষত তৃণমূল কর্মীদের সংগঠিত প্রহরা ও সতর্কতার ফলে সে সব চেষ্টা মূলত বানচাল হয়ে গেছে। (৪) তাছাড়াও, নির্বাচন যতো এগিয়ে এসেছে, অনিল বসু-সুশান্ত ঘোষ প্রভৃতিরাই ততোই চরম আস্ফালন ও অভূতপূর্ব অশালীন আক্রমণের পথ ধরেছে। রাজনৈতিক ড্যামেজ কন্ট্রোলের শেষ মুহূর্তে কিছু চেষ্টা করলেও, স্থানীয় পার্টিসংগঠনের চাপে ও স্বার্থে সেগুলি তেমন ফলপ্রসূ হয় নি।

এসবের সম্মিলিত প্রভাবেই সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের চরম ভরাডুবি ঘটেছে।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই

১৫ পৃষ্ঠায় পর

মুক্তি দেবার কথা বিবেচনা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেটা যে ন্যায়সঙ্গত নয়, সে কথা আমরা এই লেখায় দেখিয়েছি। এই লেখা শেষ করার মুহূর্তে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা থেকে যা জানা গেল, তা আরও অসঙ্গত; ন্যায় ও বিবেকের দাবির আরও বেশি পরিপন্থী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রিভিউ কমিটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে জেলের মধ্যে বন্দীদের আচরণ এবং মুক্তি পেলে বাইরে গিয়ে আবার অশান্তি বা 'অপরাধ' করবেন কিনা তা বিবেচনা করে দেখবেন। প্রথম ক্ষেত্রে জেলের ভিতরের আচরণ সম্পর্কে স্বভাবতই নির্ভর করা হবে স্বৈরতান্ত্রিক পূর্বতন সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের উপর। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বন্দীদের কার্যত প্রতিশ্রুতি (বা মুচলেকা) দিতে হবে— তারা বাইরে গিয়ে গণ্ডগোল পাকাবেন না। ভোটে অধিকাংশ মানুষের সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও এই চরম অপমানজনক শর্ত চাপিয়ে দেবার অধিকার এই সরকারকে কেউই দেয়নি। ক্ষমতাচ্যুত 'স্বৈরতন্ত্রী' বামফ্রন্ট সরকার পর্যন্ত ব্যাপক মানুষের দাবি মেনে নিয়ে ক্ষমতায় এসেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়েছিলো— 'রিভিউ' বা পর্যালোচনার আমলাতান্ত্রিক পরামর্শকে 'টালবাহানার প্রচেষ্টা' বলে অভিহিত করে। বর্তমান সরকার এই অভিনন্দনযোগ্য পূর্ব-দৃষ্টান্তকে পদদলিত করে রাজনৈতিক কর্মীদের কার্যত মুচলেকার ভিত্তিতে মুক্তি দিতে চাইছেন— এটা চরম অপমানজনক ও প্রচণ্ড প্রতিবাদযোগ্য। এর বিরুদ্ধে এক্ষুণি প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দ্বিধা দেখালে বা নানা অজুহাতে অস্বীকার করলে, সেটা হবে মানবতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি, ন্যূনতম মানবাধিকার চেতনার প্রতি, নগ্ন বিশ্বাসঘাতকতা।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

স্মরণ

বাদল সরকার ঃ তৃতীয় থিয়েটারের অনন্য কাণ্ডারী

অরূপ মুখোপাধ্যায়

নাট্যকার বাদল সরকার তাঁর 'স্পার্টাকুস' নাটকের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"জীবনে যে ক'টি উপন্যাস ভালো লেগেছে, হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকুস তার মধ্যে একটি। ঐ উপন্যাসকে থিয়েটারে আনবার কল্পনা বেশ কয়েকবার করেছি। সাহসে কুলায়নি।"

"সে সাহস শেষ পর্যন্ত পেলাম, যখন প্রচলিত 'প্রোসেনিয়ম' মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'অঙ্গনমঞ্চ' ধরলাম। 'অঙ্গনমঞ্চ' অভিনেতাকে দর্শকের কাছে নিয়ে আসে, মাঝখানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। স্পার্টাকুস অঙ্গনমঞ্চের জন্য লেখা। পরে খোলা মাঠেরও নাটক। প্রচলিত মঞ্চে এ নাটকের উপস্থাপনা আমার কাছে আজও অকল্পনীয়।"

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা তথা ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী নট, নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক বাদল সরকার তাঁর সমগ্র সৃজনশীল জীবনে বারবার নিজের গতিপথ পাল্টেছেন। ১৯৫৬ সালে একটি বিদেশি চলচ্চিত্র 'মাঙ্কি বিজিনেস' অবলম্বনে বাদল সরকারের প্রথম নাটক 'সলিউশন এক্স'।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় বাদলবাবু কর্মসূত্রে মাইথনে ছিলেন। তাঁর নাট্যকারের জীবন এইখানেই শুরু হয়েছিল। বাদলবাবুর নিজের কথায় জানা যায় যে নাট্যপাঠের প্রতি তাঁর ছিল নাড়ির টান। বরাবরই নির্ভেজাল হাসির নাটক লেখার অদম্য ইচ্ছা ছিল। সেই সময়ে বাংলার সরল হাসির নাটকের মন্দা চলছিল। সেই তাগিদেই তিনি একের পর এক লিখেছিলেন 'বড়ো পিসিমা', 'শনিবার', 'রাম-শ্যাম-যদু' ইত্যাদি ব্যঙ্গাত্মক নাট্যগুলি।

বাদল সরকারের জন্ম কলকাতায় ১৯২৫ সালে। শিক্ষাজীবন কলকাতাতেই কেটেছে। পিতা মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ। বাদলবাবু পেশায় ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। টাউন প্ল্যানার হয়ে তিনি দেশেবিদেশে প্রচুর ঘুরেছেন। জীবনে গোটা ১৮ চাকরি করেছেন। বহুবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য, ঝগড়াবিবাদ হয়েছে, ফলে কর্মস্থল বদলেছে। বাদল সরকার ছাত্রাবস্থায় এবং প্রথমজীবনে বামপন্থী মতবাদ ও রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থার সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না।

১৯৬৩ সালে বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর আবির্ভাব বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী মাইল ফলক। বাদলবাবুর নিজের কথায়, "কোনও রকম নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না করেই লিখে চললাম। যেন একটা কবিতা থেকে পরের কবিতায় পৌঁছনো, মাঝখানটা সংলাপ দিয়ে ভরা। ... থিয়েটার করি তখন, কিন্তু এটা মঞ্চস্থ করার কথা ভাবি নি, কারণ এটাকে নাটক বলে ধরিনি, এ যেন নিজস্ব ডায়েরী।"

কিন্তু এই নাটকই বাদল সরকারকে সর্বভারতীয় পরিচিতি দিয়েছিল। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' গুজরাটি, ওড়িয়া, মণিপুরী, মারাঠি, কন্নড়, তামিল প্রভৃতি ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশ কার্নাড স্বয়ং ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তবে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের অনুপম কাব্যসুষমামণ্ডিত ভাষা এবং অভিনব আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তার ব্যক্তিমানুষের বিচ্ছিন্নতা, ক্লান্তি, হতাশা এবং কিছুটা নেতিবাচক জীবনদর্শনের অবসাদকে বাদলবাবু উত্তরকালে অতিক্রম করে যান।

১৯৬৪ সালে কর্মসূত্রে ফ্রান্সে থাকাকালীন বাদলবাবু 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'কবিকাহিনী', 'সারারাত্তির', 'বিচিত্রানুষ্ঠান' ইত্যাদি স্যাটায়ারধর্মী নাটক লেখেন। ১৯৬৫ সাল থেকে চাকরিসূত্রে নাইজেরিয়াতে বসবাসকালে বাদল সরকার 'পাগলা ঘোড়া', 'বাকি ইতিহাস', 'প্রলাপ', 'যদি আর একবার', 'পরে কোনদিন', 'ত্রিংশ শতাব্দী', ইত্যাদি সমকালীন নাটক লিখেছিলেন। এই পর্যায়ে বাদলবাবু নগরকেন্দ্রিক ব্যক্তিমানুষের একাকীত্ব, সংকট ও জীবনযন্ত্রণাকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। পুঁজিবাদী শিল্পসভ্যতায় ব্যক্তিমানুষের দমন ও পীড়ন নাট্যকারকে এখানে ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদী দর্শনের কাছাকাছি নিয়ে যায়। কামুর 'বহিরাগত মানুষ' এই পর্যায়ে বাদল সরকারে মাথায়। 'প্রবাসের হিজিবিজি' নামক রচনায় বাদলবাবু এই প্রসঙ্গে কামুর 'Absurd man'এর কথা উল্লেখও করেছেন। তাই এই পর্বের নাট্য আঙ্গিকের ওপর পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির ছাপ প্রবল। ফর্ম ভাঙ্গচুরের সুরঙ্গপথে কোথাও কোথাও এখানে দুর্বোধ্যতা বিষয়বস্তুকে ছাপিয়ে ওঠে। আবার 'ত্রিংশ শতাব্দী'তে সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট পারমাণবিক ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ও বিভীষিকা আমাদের রক্ত হিম করে দেয়। এই নাটক দেখে সভ্যতা, মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি, পৃথিবী— সব কিছুই অর্থহীন ও ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অস্তিত্বের সংকটে তাড়িত হয় আমাদের মন। তবু বাদলবাবু পরবর্তী সময়ে মনে করেছেন যে এই সমস্যা ও আতঙ্ক শহুরে, শিক্ষিত অঙ্গুলিমেয় শ্রেণীর সত্য।

সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং টালমাটাল সময়ে তৃতীয় থিয়েটারকে হাতিয়ার করে অন্য এক বাদল সরকারের অভ্যুদয় ঘটলো। শহরের সম্পন্ন ব্যবসায়িক অথবা পেশাদার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাইরে মাঠে ময়দানে, গ্রামে মফঃস্বলে, শ্রমিক বস্তি বা সুদূর বনাঞ্চলে, ছোট ছোট সভাগৃহে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক নাটক হল তৃতীয় থিয়েটারের আন্দোলন।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

এই নাটকগুলি অনেকাংশেই প্রচারমূলক, কিন্তু শিল্পবিরোধী নয়। বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটারের নাটকগুলি ছিল খুব সচেতন ও স্বেচ্ছারভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সমাজ-বাস্তবতার আদর্শে কমিটেড। শহরাশ্রিত মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক চৌহদ্দির বাইরে এবং প্রোসেনিয়াম থিয়েটারের নিরাপদ দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে বাদল সরকার এবার তাঁর 'শতাব্দী' নাট্যদল নিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত রাঙ্গাবেলিয়া থেকে বর্ধমানের পাণ্ডববর্জিত গ্রামে অঙ্গনমঞ্চের পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থায় তৃতীয় ধারার রাজনীতি, বাদল সরকারের এই তৃতীয় নাট্য ধারাকে আশ্রয় করে তার কণ্ঠস্বরকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার হাতিয়ার করে। বাদল সরকার প্রতি শনিবার কার্জন পার্কে প্রতিবাদী নাটক নিয়মিতভাবে অভিনয় শুরু করেন। সিদ্ধার্থ রায়-এর সরকার বাদল সরকারকে কেন্দ্র করে গণরাজনীতির এই উত্থান দেখে এক সময় পুলিশ পাঠিয়ে অ্যাকাডেমি-র উল্টোদিকে বাদল সরকারের নাটক বন্ধ করে দেয়।

১৯৬৯ সালে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের সময়ে বাদল সরকারের সৃজনশীল সত্তা ও মনন অন্য এক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। পোলান্ডের বিশ্ববিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব ও সমান্তরাল থিয়েটারের জনক এবং 'Towards A Poor Theatre' গ্রন্থের লেখক ইয়েরি্স গ্রোতোভস্কির সঙ্গে এই সফরে বাদলবাবুর পরিচয় হয়েছিল। বাদলবাবুর সঙ্গে এই সময়ে গ্রোতোভস্কিকে জড়িয়ে অনেক বিতর্কের জল গড়িয়েছে। বাদলবাবু লিখেছেন যে, গ্রোতোভস্কির Poor Threatre-এর তত্ত্ব তাঁকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু তাঁর তৃতীয় থিয়েটার গ্রোতোভস্কির গবেষণাগারে সৃষ্টি হয় নি।

সত্তরের দশকের শুরুতে বারতে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যশাস্ত্রের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং বিশ্বখ্যাত 'The Drama Review' পত্রিকার সম্পাদক রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে বাদলবাবুর আলাপ হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে শেখনারের আমন্ত্রণে বাদলবাবু দুমাসের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় গিয়ে শেখনারের 'Physical Theatre' প্রত্যক্ষ করেন বিভিন্ন নাট্য ওয়ার্কশপের মাধ্যমে। বাদলবাবুর বিশ্বাস ছিল যে, থিয়েটারে শরীরের সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার অপরিহার্য। তাই ভারতীয় গ্রামীণ লোকনাট্য এবং ধ্রুপদী নৃত্যকলা আজ পশ্চিমের শিল্পজগতে প্লাবন এনেছে।

তবে বাদল সরকারকে নিয়ে বাংলার নাট্যমহলে অনেক বাকবিতণ্ডা ও বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় উঠেছে মার্কিন মুলুকের Living Theatre-এর স্থপতি জুলিয়ান বেককে কেন্দ্র করে। কিন্তু বাদলবাবুর বক্তব্য ছিল যে, জুলিয়ান বেকের 'The life of Theatre' বইটি বেশির ভাগই না পড়ে তাঁকে যৌন বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করেন। অন্যদিকে বাদলবাবু লিখেছেন—"এই বইটা থেকে অনেক কিছু শিখেছি, যা আমার মূল দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে, আমাদের থিয়েটারের নীতিকে জোরদার করেছে।" অবশ্য বাদলবাবুর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল যে, 'Living Theatre'-এর যৌন বিপ্লবের জেহাদ— ওঁদের চূড়ান্ত যৌনচেতনা ও নগ্নতা সমকালীন ভারতীয় জীবনে সত্য নয়।

পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণকালে বাদলবাবু মস্কোর Taganka থিয়েটারে ব্রেখটের 'Galileo', 'Good person of Schezwan' এবং 'Ten days that shook the world' দেখে গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। বাদলবাবুর মতে মস্কোর Taganka থিয়েটারের Lyubimov বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী নাটপরিচালক।

বাদল সরকার তাঁর 'থিয়েটারের ভাষা' বইতে লিখেছেন — "তৃতীয় থিয়েটারের সবচেয়ে বড়ো কথা— বক্তব্য। বক্তব্য কী করে সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে তীব্র করে তোলা যায় দর্শকের কাছে, কী করে দর্শকের মনে নাড়া দিয়ে তার চেতনার পরিবর্তন আনা যায়, তাকে কোনো একটা সিদ্ধান্তের দিকে, কোনো একটা ক্রিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া যায়— এটাই তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্য।"

বাদল সরকারের 'শতাব্দী' নাট্যদল অঙ্গনমঞ্চে 'স্পার্টাকুস', 'মিছিল', 'ভোমা', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', 'হট্টমালার ওপারে', 'গণ্ডী' (ব্রেখটের 'ককেসিয়ান চক সার্কল' অবলম্বনে), 'বাসি খবর', 'পদ্মানদীর মাঝি' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে), 'খাটমাট ক্রিং' ইত্যাদি থিয়েটার নিয়ে চারদশকব্যাপী প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাধনা চালিয়ে গেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটার তথা অঙ্গনমঞ্চ বা খোলা মাঠের থিয়েটার কি আমাদের দেশে আদৌ নতুন কিছু? ১৯৫১ সাল থেকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পরিচালনায় এখানে পথনাটকের ইতিহাস শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে আইপিটিএ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে এবং পরপর নির্বাচনের ময়দানে প্রচারমূলক পোস্টারনাটক এবং পথনাটক করে গেছে ধারাবাহিকভাবে। অঙ্গনমঞ্চের নাটক তো মৌলিকভাবে পথনাটকই। ষাটের দশক থেকে আমরা দেখেছি উৎপল দত্তের রচনা ও পরিচালনায় সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের সমর্থনে প্রবল পার্টিজান পথনাটক (স্পেশাল ট্রেন, গেরিলা, সমাধান (ব্রেখট অবলম্বনে)। তারপর দীর্ঘ তিনদশক ধরে বাংলার মাটিতে পথনাটকের গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে।

তবু বাদল সরকারের প্রথাবিরুদ্ধ, রাজনীতিসচেতন তৃতীয় থিয়েটার আমাদের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্তম্ভস্বরূপ। কার্জন পার্কের রক্তাক্ত মাটিতে (প্রবীর দত্তের হত্যা), অ্যাকাডেমির তিনতলার কক্ষে, ওয়েলিংটনের নাট্য অঙ্গনে, প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে, সিন্ধুভবনে কিংবা থিওসফিকাল সোসাইটিতে তৃতীয় থিয়েটারের আন্দোলন বছরের পর বছর বাংলার নাট্যমোদীদের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com